تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی
عَبْدِهٖ لِیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ۙ

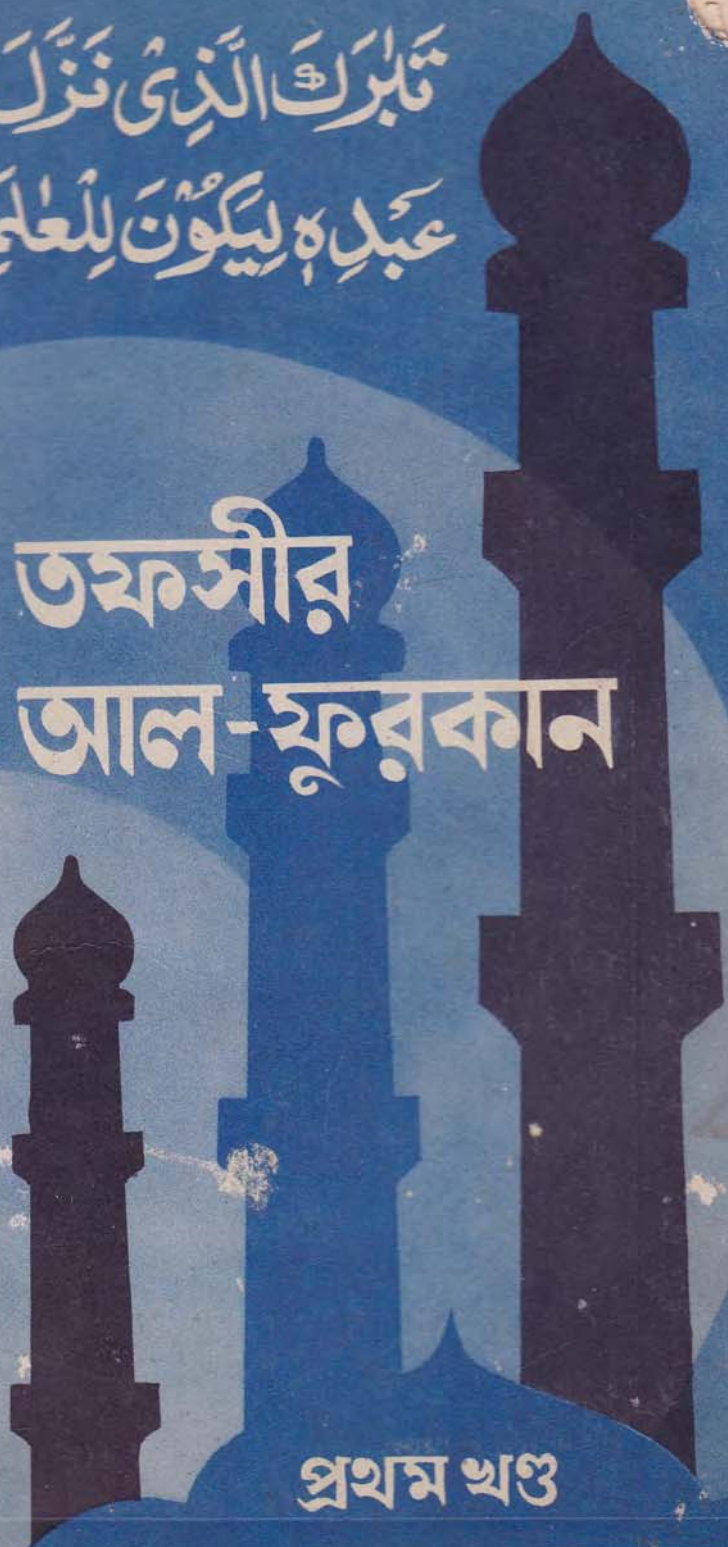

তফসীর আল-ফুরকান

প্রথম খণ্ড

সূরা আল-ফাতেহা

প্রকাশনায় :
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা-১

প্রথম সংস্করণ : ২২৫০ কপি
ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ ইসাব্দ।

হাদিয়া— নয় টাকা মাত্র

মুদ্রণে :
আলহাজ্ব আবদুস সালাম
আহমদী আর্ট প্রেস
৪ নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা-১

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

তফসীর
আল-ফুরকান

১ম খণ্ড

সুরা আল-ফাতেহা

মৌঃ মোহাম্মাদ
আমীর, জামাতে আহ্‌মদীয়া, বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

"কালামুল্লাহ্"

কুরআন করীম একমাত্র গ্রন্থ, যাহাকে কালামুল্লাহ্ বলা যাইতে পারে। অপরাপর ধর্মগ্রন্থ ইলহামী হইলেও, সেগুলি কালামুল্লাহ্ নহে। কারণ উহাদের মধ্যে মানুষের কথাও শামিল আছে। একমাত্র কুরআন করীম বিসমিল্লাহ্-র বে হইতে আরম্ভ করিয়া সুরা নাসের সিন পর্যন্ত আগাগোড়া কালামুল্লাহ্, অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার নিজস্ব বাক্য।

এই গ্রন্থ যদাবধি আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে খাতামান্নাবীয়ীন হযরত মোহাম্মাদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর নাযেল হইয়াছে, তখন হইতে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তীত রহিয়াছে। উহার মধ্যে এক শব্দ সংযোজিতও হয় নাই এবং উহা হইতে এক শব্দ বাদ দেওয়াও হয় নাই এবং উহার কোন আদেশ আমলের অযোগ্যও হয় নাই। উহার প্রত্যেকটি যের ও যবর সংরক্ষিত আছে। এমনকি উহার প্রত্যেক দাঁড়ি কমা পর্যন্ত অটুট রহিয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থ ব্যতিরেকে উক্ত বৈশিষ্টসমুহ সহ আর দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ নাই, যাহাকে পথ প্রদর্শনকারী গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, যাহার মধ্যে সন্দেহযুক্ত কোন আদেশ পাওয়া যাইবে না।

[হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহ্মদ (রাযিঃ), আহ্মদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফার তফসীরে কবীরের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত]

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

তফসীর আল ফুরকান

সুরা ফাতেহা

লেখকের নিবেদন

আযীয ও হাকীম খোদা তাঁহার অনন্ত হিকমতে জ্ঞান ও মারফতের সীমাহীন সমুদ্রকে বিন্দুবৎ সুরা ফাতেহার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই তফসীর দ্বারা ঐ সমুদ্রে প্রবেশ-দ্বার খোলা হইয়াছে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে কেহ ইহা হইতে পান করিবে, আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে সে, আত্মার তৃপ্তি ও শান্তির পথ পাইবে।

পবিত্র কুরআনের নযুল, উহার সমাহার, সংরক্ষণ, পাঠ করানোর দায়িত্ব যেমন তিনি নিজের উপর লইয়াছেন, তেমনি ইহার বিশদ ও যথার্থ ব্যাখ্যার দায়িত্বও নিজের উপর রাখিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি বলিয়াছেন : ان علينا جمعه و قرانه ٥ فاذا قرانه فاتبع قرانه ٥ ثم ان علينا بيانه ٥ "নিশ্চয় ইহার (কুরআন করীমের) সমাহার ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের উপর। সুতরাং যখন আমরা ইহা পাঠ করি, তখন তুমি (হে রসুল) ইহা পাঠ কর। অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমাদের উপর।" (সুরা কিয়ামা-১ম রুকু)।

আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার ওয়াদা অনুযায়ী যুগে যুগে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিগণের মারফৎ যুগের প্রয়োজন উপযোগী পবিত্র কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। বর্তমান যুগে তিনি যুগ ইমাম ও তাঁহার খোলাফার মারফৎ এ দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। এই তফসীর সেই উৎসের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে।

যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ), ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী পবিত্র কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যাবলীতে ভরপুর। তাঁহার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারে তাঁহার দ্বিতীয় খলিফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহ্মদ (রাঃ) উক্ত কার্যের সম্প্রসারণ করেন। বর্তমান তফসীরের যাবতীয় উপাদান ও উপকরণ উক্ত দুই উৎস হইতে বিশেষ করিয়া হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর অমর 'তফসীরে কবীর' এবং অপরাপর গ্রন্থাবলী ও বিভিন্ন খুতবা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা হইতে সকল বরকত খাতামান্নবীয়ীন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আসিয়াছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এক ইলহাম আছে : كل بركة من محمد صلى الله عليه و سلم "সকল বরকত মোহাম্মাদ সাল্লালাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে।" যুগ-ইমাম ও তাঁহার খোলাফার মারফৎ যে বরকতের ধারা প্রবহমান, উহা প্রকৃতপক্ষে হযরত

মোহাম্মাদ (সাঃ) হইতে আসিয়াছে এবং এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত প্রবহমান থাকিবে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে ছাড়িয়া কোন বরকত নাই এবং তাঁহার বাহিরে কোন নে'মত নাই।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাঁহার প্রণীত সুরা ফাতেহার তফসীর সম্বন্ধে এক অপূর্ব রুইয়া দেখিয়াছিলেন। উহার উল্লেখ পাঠক বর্গের জন্য ঈমান-বর্ধক হইবে বিবেচনায় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমি দেখিলাম পূর্ব দিকে মুখ করিয়া আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমার সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ ময়দান। সেই ময়দানে চিনা মাটির পাত্রে আঘাত করার ন্যায় এক শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দ আকাশে ছড়াইয়া গেল। অতঃপর সেই শব্দের মধ্যবর্তী অংশ রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল এবং উহার মধ্যে ছবির চৌকাঠের ন্যায় এক চৌকাঠ প্রকাশিত হইতে লাগিল। অতঃপর ঐ চৌকাঠে হালকা রং সৃষ্টি হইতে লাগিল। অবশেষে ঐ রং উজ্জল হইয়া দেহ পরিগ্রহ করিল এবং উহার মধ্যে স্পন্দনের সৃষ্টি হইল এবং উহা এক জীবন্ত দেহে পরিণত হইল। আমার মনে হইল উহা এক ফেরেশ্‌তা। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি কি আপনাকে সুরা ফাতেহার তফসীর শিখাইব?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আপনি নিশ্চয় আমাকে সুরা ফাতেহার তফসীর শিখান।" অতঃপর সেই ফেরেশ্‌তা আমাকে সুরা ফাতেহার তফসীর শিখাইতে লাগিলেন। তিনি اياك نعبد و اياك نستعين পর্যন্ত পৌঁছিয়া বলিলেন, "এ যাবৎ যত তফসীর করা হইয়াছে, উহা এই পর্যন্ত। ইহার পর আর কোন তফসীর লেখা হয় নাই। এখন কি আমি ইহার পরবর্তী আয়াত সমূহেরও তফসীর শিখাইব?" আমি বলিলাম, "হাঁ।" তখন সেই ফেরেশ্‌তা আমাকে اهدنا الصراط المستقيم হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ আয়াত পর্যন্ত তফসীর শিখাইলেন। অতঃপর আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। তখন তফসীরের দুই একটি কথা আমার স্মরণ ছিল। কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন আমি জাগিয়া উঠিলাম, তখন আর তফসীরের কোন অংশ আমার মনে ছিল না। ইহার কিছু কাল পরে এই সুরার বিষয় আমাকে কিছু বলিতে হয়। তখন আমি দেখিলাম ইহার নূতন নূতন অর্থ আমার মনে অবতীর্ণ হইতে লাগিল এবং আমি বুঝিলাম ফেরেশ্‌তার তফসীর শিক্ষা দেওয়ার ইহাই অর্থ ছিল। তদনুযায়ী তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাকে সদা নূতন নূতন অর্থ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, যেগুলির মধ্যে শতশত, বিভিন্ন গ্রন্থাবলী ও বক্তৃতায় বর্ণনা করিয়াছি। ঐ খাজানা খালি হয় নাই।"

এই প্রসঙ্গে, এই আজেয্ বান্দার আজ হইতে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বেকার এক রুইয়া ও এক ইলহাম স্মরণ হইয়া গেল। যেহেতু উহাদের পূর্ণতায় আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের

জ্বলন্ত নিদর্শন রহিয়াছে, সেই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমার প্রকাশে নিম্নে উহার বর্ণনা করিতেছি।

একদিন রাত্রে আমি রুইয়ায় দেখিলাম, সুরা ফাতেহার আয়াতগুলি অপূর্ব শক্তি ও আলোক সহকারে আমার হৃদয়ের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিতেছে। এক অনির্বচনীয়-ভাবে আমি অভিভূত হইয়া গেলাম। এক ইলহামও আমার মুখে জারি হইয়াছিল, سنقرئك فلا تنسى "শীঘ্র আমরা তোমাকে (কুরআন) শিক্ষা দিব, অতঃপর তুমি ভুলিবে না।" (সুরাতুল-আলা)। তখন আমি মাত্র ২/৩ বৎসরের আহমদী। তখন আমার কুরআন করীমের কোন এলেম ছিল না। ইহার প্রায় ১০/১১ বৎসর পরে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর তফসীরে কবীরের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। উহার মধ্যে সুরা ফাতেহার তফসীর পাঠে আমি অভিভূত হইয়া গেলাম। এই তফসীর আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। মনে করিয়াছিলাম ইহাতেই আমার রুইয়া পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু উপরোক্ত ইলহামের মধ্যে "তুমি ভুলিবে না"র অর্থ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অনেক সময় চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু ইহার অর্থ কিছু খুঁজিয়া পাই নাই। পবিত্র কুরআনের তফসীরের কাজ হাতে লইয়া সুরা ফাতেহার এই তফসীর লেখার পরে উক্ত রুইয়া এবং ইলহামের নূতন অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল। আল্লাহ্‌তায়ালা যে শিক্ষার বীজ রুইয়ার মাধ্যমে আজ হইতে ৪০ বৎসর পূর্বে আমার হৃদয়ের গভীর প্রদেশে প্রোথিত করিয়াছিলেন, উহাকে তিনি যুগ-ইমাম ও তাঁহার খলিফার মোহাম্মাদী ফয়েযের পানি সিঞ্চনে ফলবতী করিয়া বিস্মৃতির-অধীন স্মরণ-ফলক হইতে আনিয়া লিখার ফলকে আঁকিয়া দিয়া তাঁহার বাণীকে সত্য করিয়াছেন। الحمد لله ইহার জন্য সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

এই তফসীরের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা কার্যে মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী, মৌলবী শাহ্ মুস্তাফিযুর রহমান সাহেব, সেক্রেটারী, তালীফ ও তসনীফ, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, মৌলবী ফযলুল করীম মোল্লা সাহেব ও মৌলবী সামসুর রহমান সাহেব, বার-এট-ল সাহায্য করিয়াছেন।

প্রুফ রিডিং-এর কাজে মৌলবী ফযলুল করীম মোল্লা সাহেব অক্লান্ত খেদমত দিয়াছেন।

কতিপয় মুখলেস বন্ধু এই তফসীর প্রকাশনার জন্য আংশিক খরচ বহন করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা ভ্রাতাগণকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিন এবং অধমের দোষ ত্রুটি মার্জনা করিয়া এই অকিঞ্চিতকর খেদমত কবুল করুন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য।

ঢাকা, শুক্রবার
২০শে ফেব্রুয়ারী
১৯৭৬ ইং

খাকসার
মোহাম্মাদ,
আমীর, জামাতে আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আউযুবিল্লাহ্-তত্ত্ব	১—৮
ইবলিস ও শয়তান	৬
শয়তান মুসলমান হয়	৭
সুরা আল-ফাতেহা	৯—১২১
সুরা ফাতেহার আরও নয় নাম	১০
ফতুহা ও সপ্ত বজ্র-ধ্বনি	১২
সপ্তম-দূত	১৩
এই সুরার ফযিলত	১৪
দোয়ার কবুলীয়তের ৭টি পন্থা	১৫
স্বপ্নে ব্যাখ্যা শিক্ষা	১৭
সুরা ফাতেহার নযুল	১৭
সুরা ফাতেহার মযমুনের সার-কথা	১৭
বিসমিল্লাহ্র ফযিলত	২২
ইহুদী ও খৃষ্টানগণ অপরাধী সাব্যস্ত	২৫
বিসমিল্লাহ্র উল্লেখ পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে	২৬
বিসমিল্লাহ্র মধ্যে ইসম শব্দ - কেন বাড়ানো হইয়াছে?	২৭
কাফ্ফারার খণ্ডন	৩৫
পুণর্জন্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের খণ্ডন	৩৬
আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিবার সন্ধান আল্লাহ্তায়ালা এবং বান্দার মধ্যে সোপান	৪২
মযমুনে পুরুষ পরিবর্ত্তনের হিকমত	৪৫
মুসলমান জাতির উন্নতির একমাত্র পথ	৪৯
কর্মে মানব স্বাধীন, অধীন নহে	৫০
হেদায়েত চিরন্তন	৫৪
কুরআন করীমের তফসীর শেষ হইবার নহে	৫৮
হেদায়েত লাভের ক্ষেত্র ব্যাপক	৫৯
এক শিখের নূর দর্শন	৫৯
চির উন্নততর মর্যাদা-লাভ মোমেনের লক্ষ্য	৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুসলমানগণের জন্য নে'মত সমূহ	৬৬
নবুওত জাতীয় নে'মত-যোগ্য ব্যক্তি লাভ করে	৬৮
খাতামান্নাবীয়ীনের পর অনুগামী নবী	৬৯
মানব-জাতি ও পবিত্রাত্মার সম্মিলিত ক্রন্দন হেদায়েতকে আকর্ষণ করে	৭৩
নবুওতের নযুলের শর্তাবলী	৭৫
যত মত তত পথ	৭৬
সুরা ফাতেহা কুরআন করীমের অংশ	৭৮
মরিয়ম ও ইবনে-মরিয়ম তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন	৭৯
মুসলমান জাতির জন্য সবক	৮০
মুসলমান জাতির লক্ষ্য মোকামে-মাহ্‌মুদ	৮১
বিশ্বে মোকামে-মাহ্‌মুদের প্রতিষ্ঠায় মানব জাতির মুক্তি	৯১
গযব-প্রাপ্ত ও পথ-ভ্রষ্ট কাহারা ?	৯২
ভবিষ্যদ্বাণী—মুশরেকদের প্রাধান্য ক্ষণস্থায়ী	৯৩
ইহুদী ও খৃষ্টানগণের পথ হইতে বাঁচিবার জন্য দোওয়ার উদ্দেশ্য	৯৪
'সুরা ফাতেহা' ভাব, তথ্য ও তত্ত্বের সীমাহীন জগত	৯৪
আধ্যাত্মিক আরোহণ ও অবরোহন সোপান	১০৪
খোদালাভের রুহানী অনুশীলনী সোপান	১০৬
মালেকে ইয়াওমেদ্দীন সিফতের অনুশীলন	১০৭
রহীমীয়তের অনুশীলন	১১০
রহমানীয়তের অনুশীলন	১১১
রবুবীয়তের অনুশীলন	১১১
সৃষ্টির সেবায় নবী	১১৩
সকল প্রশংসার অধিপতির বিকাশক 'প্রশংসিত' নামের হকদার	১১৪
মোহাম্মাদ (সাঃ) নামের মধ্যে আহ্‌মদ (আঃ) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী	১১৪
ঐশী গুণের অনুশীলন অনুযায়ী মর্যাদা লাভ	১১৬
পুণ্যের পুরস্কার বর্ধিত হারে ও পাপের প্রতিফল সমপরিমাণে	,,
দৈহিক-সফরে গতিবেগ মন্থর এবং রুহানী-সফরে সতেজ	১১৭
সুরা ফাতেহা রুহানী সফরে রক্ষাকবচ	১১৭
জাতিগত কল্যাণ-লাভ ও ধ্বংসের চক্রশেষে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা	১১৮
পথহারা বান্দার জন্য আল্লাহতায়ালার প্রেমের দৃষ্টান্ত, এক সদ্য সন্তান-হারা জননীর ন্যায়	১১৯
দোওয়ার কবুলিয়তের জন্য দুইটি বিষয় জরুরী	১২০

তফসীর আল-ফুরকান

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আমি আশ্রয় চাহিতেছি আল্লাহ্‌র নিকট
বিতাড়িত শয়তান হইতে।

আউযুবিল্লাহ্-তত্ব

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার পাক কালামে আদেশ দিয়াছেন যে, কুরআন মজিদ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে আউযু পড়িবে। (৭৭ : اَلنَّحْل) إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

'যখন তুমি কুরআন পাঠ আরম্ভ কর, তখন প্রথমেই আল্লাহ্‌তায়ালার আশ্রয় চাহিয়া লও' অর্থাৎ সর্ব প্রকার অমঙ্গলের মোকাবিলা করিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য এবং আশ্রয় যাচনা কর। আশ্রয় দুই প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার আশ্রয় হইল, কোন অমঙ্গল যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে এবং আর এক প্রকার আশ্রয় হইল, কোন মঙ্গল যেন আমাদের হস্তচ্যুত না হয়। إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

আয়াতের নির্দেশের মধ্যে উভয় প্রকার আশ্রয় অন্তর্ভুক্ত। আশ্রয় যাচনা করার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের অন্তরের কোন ব্যাধির জন্য, কুসংসর্গের জন্য অথবা কোন পাপের ফল-স্বরূপ পবিত্র কুরআনে যে উচ্চ হইতে উচ্চতর মানের শিক্ষা সমূহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যেন আমরা বুঝিতে পারিয়াও পালনে উপেক্ষা করিয়া কল্যাণ হইতে বঞ্চিত না হই। পক্ষান্তরে এমনও যেন না হয় যে, আমরা এই শিক্ষাকে সঠিকভাবে বুঝিতে অক্ষমতা বশতঃ ভ্রমে পতিত হইয়া নিজেদের জন্য অমঙ্গল ডাকিয়া আনি। এই আশ্রয় ভিক্ষাকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার জন্য যে দোওয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইল أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 'আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় যাচনা করি।'

কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, এই আদেশ দ্বারা কুরআন তেলাওত করার শেষে আউযু পড়ার নির্দেশ বুঝায়, আরম্ভে নহে। বস্তুতঃ কুরআন মজিদের বিষয়বস্তুর ঐশী বিন্যাসে পাক কালাম দুই আউযের সুরায় শেষ হইয়াছে। যথা সুরা ফালাক ও সুরা নাস। সুতরাং এই বিন্যাসের শিক্ষার আলোকে দৈনন্দিন তেলাওতের শেষেও আউযু পাঠ নিশ্চয় উত্তম। কিন্তু আলোচ্য আউযু পড়ার কুরআনী আদেশকে কুরআন তেলাওতের প্রারম্ভেই আউযু পড়ার নির্দেশ বলিয়া মানিতে হইবে। কারণ ইহাই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সুন্নত ছিল। যথাঃ- إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَقَالَ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ —তকবীরের পরে এবং কুরআন তেলাওতের পূর্বে আঁ-হযরত (সাঃ) আউযু পড়িতেন। আবু সঈদ (রাঃ) হইতে আবু দাউদ রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তসবীহ্ ও তহ্‌মীদের পর এবং তেলাওতের পূর্বে তিনি আউযু পড়িতেন। আবু দাউদে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা আছে যে, কুরআনের আয়াত তেলাওতের পূর্বে তিনি আউযু পাঠ করিতেন। (দুররে মনসুর)।

কুরআনের আদেশ সম্বলিত আয়াতও ইহার বিরোধী নহে। কারণ قَرَأَ 'কারা' শব্দের অর্থ পড়া আরম্ভ এবং শেষ করা উভয়ই বুঝায়।

আউযু পড়ার সম্বন্ধে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। পবিত্র কুরআনের শেষ পারার সুরাগুলি ক্রমশঃ আকারে ছোট হইতে আরও ছোট এবং সহজ হইতে সহজতর হইয়াছে

বলিয়া ছেলেদের পাঠারম্ভের সুবিধার্থে আমপারার সুরাগুলির তরতীব উল্টা করিয়া সাজাইয়া তাহাদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়। ইহাতে ছেলেদের জন্য সুরা ফাতেহার পর পবিত্র কুরআনের প্রথম সবক আসে আমপারার قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ "বল : আমরা আশ্রয় চাহি মানব জাতির রবের নিকট"। ইহার পরবর্তী সুরায়ও আল্লাহ্র আশ্রয় চাওয়া হইয়াছে। এই ভাবে ছেলে মেয়েরা সুরা ফাতেহা পাঠের পূর্বে একবার আউযুবিল্লাহ্ পড়ে এবং পরবর্তী দুই সুরাতেও রবের আশ্রয় চাহে। তাহারা যখন আমপারা শেষ করিয়া পবিত্র কুরআনের তেলাওত গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া কুরআন শরীফ খতম করে, তখন তাহারা সুরা ফালাক্ ও সুরা নাসে দুই আউযু পড়িয়া শেষ করে।

বয়স্কগণের পবিত্র কুরআনের পাঠারম্ভ আল্লাহ্তায়ালার আদেশে আশ্রয় চাওয়া দ্বারা হয় এবং ছেলেদের আরম্ভ একদিকে আল্লাহ্তায়ালার আদেশনুযায়ী তাঁহারই আশ্রয় চাহিয়া এবং অন্যদিকে প্রত্যক্ষভাবে সুরা আরম্ভের মধ্য দিয়া আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় চাহিয়া হয়। তাহারা আবার যখন কুরআন পাঠ শেষ করে, তখনও তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার শেষের ছোট সুরাগুলির মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় চাওয়ার দ্বারা শেষ করিতে হয়। প্রশ্ন জাগে, এইভাবে আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় চাহিয়া পবিত্র কুরআনের পাঠারাম্ভ এবং তাঁহার আশ্রয় চাহিয়া শেষ করার মধ্য কি প্রজ্ঞা রহিয়াছে?

কুরআন মজিদ পাঠের বিষয় আগে ও পরে আল্লাহ্তায়ালার নিকট আশ্রয় চাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ্তায়ালার বাণী হইতে পূর্ণ কল্যাণ লাভ করার ও অকল্যাণ হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা।

এখানে আরও একটি জানিয়া রাখার বিষয় এই যে, পবিত্র কুরআনের যে কোন আয়াত পাঠ করিবার পূর্বে যেখানে 'বিসমিল্লাহের রহ্মানের রহীম" আয়াত নাই, সেখানে শুধু "আউযুবিল্লাহে মিনাশ্ শ্যায়তানের রাজিম" পাঠান্তে তেলাওয়াত করিতে হইবে। অনেকে ভুল করিয়া যেখানে "বিসমিল্লাহ্" আয়াত নাই, সেখানেও "আউযুবিল্লাহ্"র পর "বিসমিল্লাহ্" পড়িয়া থাকেন। ইহা ঠিক নহে। কারণ, 'বিসমিল্লাহের রহ্মানের রহীম'ও একটি আয়াত এবং যেখানে যেখানে উহা পাঠের প্রয়োজন, আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং এই আয়াত সেখানে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

পবিত্র কুরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় চাওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপের কারণ এই যে, প্রত্যেক বস্তুর একটি দেহ এবং একটি প্রাণ আছে। এই দুইটির একত্র সমন্বয়ে বস্তুটি ক্রিয়াশীল থাকে। পবিত্র কুরআন সম্বন্ধেও উক্ত দুইটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। উহার মূলবচন দেহ-স্বরূপ এবং উহার প্রকৃত অর্থবোধ প্রাণ-স্বরূপ। যে ব্যক্তি এই

দুইটি বিষয়ই লাভ করে, সে সর্বকর্মে সক্রিয় থাকে। দেহ ছাড়া আত্মা ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না এবং আত্মা ছাড়া দেহ নিষ্ক্রিয়। পবিত্র কুরআনের মূলবচন পাঠের প্রারম্ভে এবং শেষে আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনার যেরূপ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, সেইরূপ উহার অর্থ-বোধের বেলায়ও আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় চাওয়া প্রয়োজন রহিয়াছে।

আল্লাহ্তায়ালা যখন যে দোওয়া শিক্ষা দেন, তখন তিনি তাহার কবুলীয়তের ব্যবস্থাও করেন। অকল্যাণ হইতে বাঁচিবার এবং পবিত্র কুরআন হইতে কল্যাণ লাভ করিবার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় দিকই রহিয়াছে। উহার মূলবচন যেমন শুদ্ধ থাকা প্রয়োজন, উহার ব্যাখ্যা জানারও তেমনি প্রয়োজন। তিনি আপন করুণায় উভয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহার মূলবচন বিকৃত হইলে ধর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইত। তাই তিনি পবিত্র কুরআনে ওয়াদা করিয়াছেন : ০ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয়ই আমরা এই যিক্র (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই আমরা ইহার রক্ষক হইব।"—(সুরা আল-হিযর ১ম রুকু, ১০ম আয়াত)। এই ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনের মূলবচনকে হাফেয ও পুস্তকের মারফত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এতদ্বারা তিনি ইহার বাহ্যিক সংরক্ষণের মজবুত ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি ইহার প্রাণ বস্তুকেও রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ "তৎপর ইহার ব্যাখ্যার জিম্মাদারী আমাদেরই উপর"—(সুরা কেয়ামত-১ম রুকু, ২০শ আয়াত)। পবিত্র কুরআনের শুদ্ধ অর্থ মানুষকে জানাইবার দায়িত্বও আল্লাহ্-তায়ালা নিজে লইয়াছেন। এই ব্যবস্থা না থাকিলে আমাদিগের বহুল পরিমাণে ক্ষতির নিশ্চিত আশঙ্কা ছিল। তাই উহার ব্যাখ্যাকে শুদ্ধ রাখিবার জন্য উক্ত আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালা যুগে যুগে ধর্ম-সংস্কারকের আবির্ভাবের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করিবেন, যিনি তাহাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবেন।"

(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড)।

যুগে যুগে মানুষের পার্থিব জ্ঞানের উর্দ্ধগতি ও ধর্মীয় জ্ঞানের অধোগতির সহিত কুরআন মজিদের অর্থ বুঝিতে যে ভ্রান্তির সম্ভাবনা, উহার প্রতিকারের জন্য তিনি প্রত্যেক শতাব্দীতে সংস্কারক

প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ যাবৎ মোজাদ্দেদগণ প্রত্যেক শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে আমাদিগের জন্য যুগোপযোগী ও শুদ্ধ করিয়া দিয়া আসিতেছেন। (হুজাজুল কেরামা দ্রষ্টব্য)

সুতরাং কুরআন মজিদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা বজায় রাখিয়া আল্লাহ্তায়ালা যেমন নিজ ওয়াদা রক্ষা করিয়া আমাদিগের জন্য পূর্ণ কল্যাণ লাভের ও সকল অকল্যাণ হইতে বাঁচিবার সুযোগকে অব্যাহত রাখিয়াছেন, সেইরূপ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ দোওয়া পাঠের মাধ্যমে কুরআন মজিদের মূলবচন পাঠ ও শুদ্ধ অর্থ শিক্ষার যুগোপযোগী ব্যবস্থার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একদিকে যেমন প্রত্যেক যুগে বিশেষ বিশেষ ভ্রান্তি দেখা দেয়, তেমনি যুগ-ইমাম পবিত্র কুরআনের শুদ্ধ ব্যাখ্যার দ্বারা পবিত্র কুরআনের প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, অর্থাৎ উহার শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কায়েম রাখেন। আমরা যেমন কুরআন মজিদের মূলবচন শুদ্ধ ভাবে পাঠের দিকে মনোযোগী থাকি, তেমনি যেন আমরা উহার শুদ্ধ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থারও পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করি। নচেৎ আমরা কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইব এবং অমঙ্গল আসিয়া আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাই বলিয়াছেন— مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً الْجَاهِلِيَّةِ অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মানিয়া মরিবে, তাহার জাহেলিয়াতের মৃত্যু হইবে।" (মুসনাদ আহ্মদ বিন হাম্বাল)।

বর্তমানে পার্থিব জ্ঞানের উন্নতি ও আধ্যাত্মিক পতনের যুগে মানব জাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ্তায়ালা আউযুবিল্লাহ্ দোওয়া পাঠের কবুলীয়তে এবং তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সচল ও যুগোপযোগী প্রমাণার্থে প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-কে আবির্ভূত করিয়াছেন। কর্মদোষে আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া যখন পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে কোন কোন উলামা পর্যন্ত মত প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যে, কুরআন (নাউযুবিল্লাহ্) অকোজো পুস্তক এবং পবিত্র কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারা একদিকে পরস্পর দ্বন্দ্ব বিগ্রহে লিপ্ত হইলেন এবং অপর দিকে খ্রীষ্টানগণকে পবিত্র কুরআনের আয়াতের কদর্থ করিয়া ইসলামের প্রভূত ক্ষতি করিবার সুযোগ করিয়া দিয়া, পবিত্র কুরআনের সকল কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং মহা অকল্যাণে পতিত হইলেন, তখন আল্লাহ্তায়ালা হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-কে প্রেরণ করিয়া তাঁহার দ্বারা অকাট্য দলিল ও জ্বলন্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া কুরআন মজিদই যে এ যুগে সকল সমস্যা

সমাধানের জন্য একমাত্র উজ্জ্বল পথ-প্রদর্শক এবং মানব জাতিকে সকল অকল্যাণ ও বিপদাবলী হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম, তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। উলামার পারস্পরিক দ্বন্দ্বে এবং বিজাতীয়গণের আক্রমণে মানবজাতি পবিত্র কুরআনের সকল কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। ইহার ফলে জগদ্বাসীর মাথার উপর মহা বিপদ নামিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের অব্যাহত আউযুবিল্লাহ্ দোওয়া পাঠের ফলে আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং ব্যাখ্যার জিম্মাদারী পূরণে হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের কদর্থ দূর করিয়া সুসামঞ্জস্যপুর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা মহা কল্যাণের সর্বমুখী ফল্গুধারা জগতে পুনঃ প্রবাহিত করিয়াছেন। এই সকল কল্যাণ আউযুবিল্লাহ্ পাঠকারীগণের গ্রহণ করা ও জগদ্বাসীকে বিতরণ করা কর্তব্য। আল্লাহ্তায়ালা বান্দাগণের দোওয়া শুনিয়াছেন এবং আপন ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন। বান্দাগণের এখন সেদিকে মনোযোগী হওয়া এবং বহু চাওয়ার নে'মতকে গ্রহণ করা ও উহার মর্যাদা রক্ষা করা প্রয়োজন।

আলোচ্য দোওয়ায় শয়তানের নাম থাকায় সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলে আউযু সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা অসম্পুর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাই এ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

ইবলিস ও শয়তান

কুরআন মজিদে দুইটি বিরোধী শক্তির বার বার উল্লেখ হইয়াছে। এক হইল ইবলিস এবং দ্বিতীয় হইল শয়তান। যেখানে যেখানে হযরত আদম (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণের উল্লেখ আছে, সেখানে ইবলিসের নাম লওয়া হইয়াছে এবং যেখানে মানুষকে বিপথগামী করার বিষয় উল্লেখ আছে, সেখানে শয়তানের নাম লওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক নবীর বিরুদ্ধে এক দল লোক খাড়া হয়। হযরত আদম (আঃ)-এর যুগেও একদল লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের যে নেতা ছিল, তাহার নাম ইবলিস। শয়তানের কোন স্বাধীন সত্তা নাই। তাহার অবস্থান মানুষের মনে, যাহাকে কুমতি বলে। যে সকল লোক কুমতির আহ্বানে নিজেরা বিপথগামী হয় এবং মানুষকেও বিপথগামী করে, তাহাদিগকে শয়তান বলে। ইবলিসও শয়তান ছিল। পবিত্র কুরআনে শয়তান শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই জন্য শয়তান হইতে বাঁচিবার জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিলে ইবলিসও অন্তর্ভূক্ত হইয়া যায়। তাহার নিকট হইতে বাঁচিবার জন্য আর পৃথক ভাবে আশ্রয় চাহিবার প্রয়োজন নাই।

ইবলিস ও ইবলিসের প্রতীক যাহারা, তাহারা অহঙ্কারে স্ফীত হয়। তাহারা মাথা নত করে না। প্রত্যেক যুগ-নবীর বিরুদ্ধবাদী নেতা যুগ-ইবলিস। তাহারা কখনও সহজে হেদায়েত গ্রহণ করে না।

শয়তান মুসলমান হয়

কুমতি বা কুপ্ররোচণা দাতা ব্যক্তিগণের মধ্যে আমুল পরিবর্তন অসম্ভব নহে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শয়তান অবস্থিত এবং তাঁহার মধ্যেও, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যে তাঁহার শয়তান মুসলমান হইয়া গিয়াছে। (মুস্লীম)।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুমতি ও কুমতি আছে। যদি ব্যক্তির মধ্যস্থিত কুমতির ভিতর আল্লাহ্তায়ালার হেদায়েত ক্রিয়াশীল হয়, তাহা হইলে তাহার কুমতি সুমতিতে পরিবর্তীত হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্থলে, যদি পথের উপর কোন মূল্যবান বস্তু পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে একজন ভাল ও একজন মন্দ মানুষের মনে দুই রকম প্রতিক্রিয়া হইবে। আল্লাহ্তায়ালার হেদায়েতের সহিত সম্বন্ধহীন ব্যক্তির কুমতি তাহাকে পথে পড়িয়া থাকা বস্তুটি নিজ ব্যবহারের জন্য নীরবে কুড়াইয়া লইতে বলিবে। কিন্তু হেদায়েত দ্বারা এক পরিশুদ্ধ ব্যক্তির কুমতি বলিবে বস্তুটি কুড়াইয়া লও, কি জানি পাছে কোন দুষ্ট লোক উহা লইয়া হজম করিয়া ফেলে, তুমি মালিকের সন্ধান করিয়া বস্তুটি তাহার নিকট পৌঁছাও। ইহার পর যদি যথেষ্ট চেষ্টার ফলে সে মালিকের সন্ধান না পায়, তাহা হইলে তাহার কুমতিও সুমতির সহিত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিবে, বস্তুটি নিজের ব্যবহারে না লাগাইয়া গরীব দুঃখীজনের মধ্যে বিতরণ করিয়া দাও এবং সে তাহাই করে।

মন্দ ব্যক্তির কুমতিও হেদায়েত গ্রহণের পর সুমতিতে পরিণত হয়। তখন সুমতি ও পরিশুদ্ধ কুমতির যুগ্ম শক্তির সাহায্যে সে দ্রুত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করে। নবীর স্পর্শে তাঁহার সমসাময়িক বিপথগামী ব্যক্তিগণের সুপথ লাভ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হওয়ার ইতিহাস এই কথাই প্রমাণ করে।

এখানে পরিশুদ্ধ কুমতির কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সাধারণতঃ কুবৃত্তিগুলি যথা ষড়রিপু কুমতির লীলাক্ষেত্র এবং সুবৃত্তিগুলি যথা দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম ইত্যাদি সুমতির লীলাক্ষেত্র। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের বল্গাহীন পরিচালনা এবং সুমতির কর্মে বাধা সৃষ্টির দ্বারা কুমতি বিশ্বে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু উহার মুখে যখন আল্লাহ্তায়ালার হেদায়েতের বল্গা লাগিয়া যায়, তখন উহা সুমতিকে তাহার ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়া এবং রিপুগুলিকে সৎ উদ্দেশ্য ও কাজে লাগাইয়া জগতে কল্যাণের সৃষ্টি করে। পার্থিব এবং ব্যক্তি স্বার্থের জন্য বিদ্বেষ, ক্রোধ, যুদ্ধ, হত্যা ইত্যাদি মন্দ ও অকল্যাণকর, কিন্তু এইগুলি আবার খোদাতায়ালার পথে প্রকাশিত হইলে, তাহা ভাল এবং কল্যাণকর হয়। বদরের যুদ্ধে আবু জেহেল ও তাহার লস্করও যুদ্ধ করিয়াছিল এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবা (রাঃ আঃ)-ও যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষ হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে

হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উভয় পক্ষ দ্বারা হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু আবু জেহেলের যুদ্ধ ছিল অভিশপ্ত এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যুদ্ধ ছিল আশিসযুক্ত ও কল্যাণকর। এই যুদ্ধে আবু জেহেলের কুমতি উহার স্বাভাবিক শয়তানী-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কুমতি পরিশুদ্ধ মুসলমানীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। আবু জেহেল বার বার হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সহিত চুক্তি ভঙ্গ করে। এবং এই যুদ্ধে তাহার পক্ষে হেন্দার দ্বারা হযরত হামযা (রাঃ)-এর কলিজা ভক্ষণ চরম পৈশাচিক কাজ ছিল। পক্ষান্তরে হযরত রসুল করীম (সাঃ) সদা সকল অবস্থায় চুক্তি রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং যখন সত্য ও শান্তি এবং আত্মরক্ষার্থে বাধ্য হইয়াছেন, তখন তিনি যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শান্তির প্রস্তাবে বিরূপ শর্তেও তিনি শান্তি চুক্তি করিয়াছেন। আশা করি পাঠক এখন উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আমাদের মনের মধ্যে অবস্থিত কুমতি বা সমাজে অবস্থানকারী দুরাশয় ব্যক্তির কুপ্ররোচণা হইতে বাঁচিবার জন্য আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় যাচনা করা অতীব জরুরী। নচেৎ সমূহ বিপদে পতিত হওয়া ও পথভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। কুমতি বা দুরাশয় ব্যক্তি ভাল কাজে বাধা সৃষ্টি করে ও ফেৎনা করে। কুরআন মজিদ পাঠ সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ। সুতরাং এই ব্যাপারে কুমতির বা দুরাশয় ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা বড় বাধা ও ফেতনা সৃষ্টি করার আশঙ্কা রহিয়াছে এবং আমরা উহা সদা ঘটিতে দেখিয়া আসিতেছি। ঘরে বাহিরে কুরআনী শিক্ষাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা হইয়াছে। সেই জন্য আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে পবিত্র কুরআন পড়ার পূর্বে আউযু পড়ার আদেশ দিয়াছেন। ফলে কুরআনী শিক্ষা ও কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সদা সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে এবং মানুষ সুপথ পাইয়া আসিতেছে। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, প্রত্যেক কুপ্ররোচণার মুখে আউযু পড়িলে মানবকে শয়তান ছাড়িয়া দেয় এবং তাহার কুমতি মুসলমান হইয়া যায়। তাই আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনে আদেশ দিয়াছেন ০ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

অর্থাৎ "যদি তোমার উপর শয়তানের পক্ষ হইতে আক্রমণ আসে, তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় যাচনা কর।" (সুরা আরাফ-২৪শ রুকু)। এই আশ্রয় যাচনা ব্যক্তির জন্য যেরূপ ফলপ্রসূ জাতির জন্যও তদ্রূপ ফলপ্রসূ। পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক, উভয় প্রকার উন্নতির সময়ে শয়তান আমাদের পদস্খলন ঘটাইতে বিশেষ চেষ্টা করে। এইরূপ সময়ে খুব বেশী সতর্ক থাকা উচিৎ। এ সময়ে বেশী বেশী করিয়া আউযু পাঠ করিলে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হইয়া যায়।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ۔

ھوالناصر

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سَبْعُ اٰيَاتٍ

সুরা আল-ফাতেহা

মক্কী সুরা—বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে সাত আয়াত আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

(আমি) আরম্ভ করিতেছি আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত দানকারী, বার বার করুণাকারী।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

সকল (প্রকারের) প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, (যিনি) জগত সমূহের রব।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

অযাচিত দানকারী, বার বার করুণাকারী।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

বিচার সময়ের মালেক।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য যাচনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

আমাদিগকে সরল সঠিক সহজ পথে পরিচালিত কর।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ০

ঐ সকল লোকের পথে, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ, (ঐ সকল লোকের পথে) নহে, যাহাদের উপর (পরে তোমার) গযব নাযেল হইয়াছে এবং না (ঐ সকল লোকের পথে,) যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে।

এই সুরা কুরআন করীমের প্রথম অধ্যায়। ইহার আসল নাম ফাতেহাতুল কেতাব। সংক্ষেপে ইহাকে সুরা ফাতেহা বলা হয়। ইহার আরও পঁচিশটি নাম আছে। তন্মধ্যে ৯টি নাম কুরআন হাদীস সম্মত। যথা :—

সুরা ফাতেহার আরও নয় নাম

(১) সুরাতুস সালাত অর্থাৎ নামাযের সুরা। এই সুরা ছাড়া নামায হয় না। ফরয, ওয়াজেব, সুন্নত ও নফল সর্বপ্রকার নামাযে প্রত্যেক রাকাতে এই সুরা পড়িতে হয়। ফরয নামাযে মুকতাদিকেও ইহা পড়িতে হয়। অবশ্য যে এখনও সুরা ফাতেহা আয়ত্ত করে নাই, তাহার তকবীর ও তসবীহ্ পড়িলে চলিবে। এই সুরাকে আল্লাহ্তায়ালা নিজের এবং বান্দাগণের মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন, অর্ধাংশে আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ পরিচয় জ্ঞাপক গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অর্ধে বান্দার পক্ষ হইতে উহার সমান্তরাল দোওয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং এই দোওয়া কামেল। এত অল্প কথায় এরূপ ব্যাপক দোওয়া আর কোন ভাষায় নাই।

(২) সুরাতুল হাম্দ অর্থাৎ প্রশংসার সুরা। এই সুরার মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলী ও বান্দার পক্ষ হইতে দোওয়ার ভাষা উভয়েই আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাতে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য এবং বান্দার প্রতি আল্লাহ্তায়ালার ফযল ও রহমের মধুর সম্পর্ক বর্ণিত হইয়াছে। এ সকলই আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসার প্রকাশক।

(৩) উম্মুল কুরআন অর্থাৎ কুরআনের মাতা। বস্তুতঃ সুরা বকর হইতে সারা কুরআনে সুরা ফাতেহার বিস্তারিত মযমুন বিবৃত হইয়াছে। সুরা ফাতেহায় যে হেদায়েতের জন্য দোওয়া করা হইয়াছে, উহারই ফলে বাকি সারা কুরআনের নযুল। অন্য কথায় সুরা ফাতেহা কুরআনের জন্মদাত্রী।

(৪) আল কুরআনুল আযীম অর্থাৎ মহান কুরআন। ইহার মধ্যে মহান বিষয়াবলী বর্ণিত হইয়াছে এবং যে ইহার উপর আমল করে, সে মহান মর্যাদা লাভ করে।

(৫) আস্-সবয়ুল মাসানী অর্থাৎ বার বার পঠিত সাত আয়াত। নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রাকাতে ইহা পাঠ করিতে হয়। ইহা ছাড়া বিপদে আপদে, সুখে, শান্তিতে,

বক্তৃতা, দোওয়া ইত্যাদির প্রারম্ভে এই সুরা পঠিত হয়। যদিও ইহাতে মাত্র সাতটি আয়াত আছে, তথাপি ইহার দ্বারা সকল জরুরত ও সমস্যার সমাধান হয়।

(৬) উম্মুল কেতাব অর্থাৎ কেতাবের মাতা। উপরে বর্ণিত তৃতীয় দফায় ইহার উল্লেখ হইয়াছে। পবিত্র কুরআন হইল আল-কেতাব। ইহা যেমন কুরআনের মাতা, তেমনি ইহা অপর সকল ধর্ম-গ্রন্থেরও মাতা। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে ইহার অনুরূপ সুরা নাযেল হয় নাই। অপরাপর সকল গ্রন্থে খোদাতায়ালার যে স্থায়ী শিক্ষা সমূহ আছে, ঐগুলি ইহার মধ্যে পূর্ণ যৌক্তিকতা সহ সন্নিবেশিত আছে এবং ঐ সকল গ্রন্থে যে অভাব আছে, ইহাতে তাহা পূর্ণ করা হইয়াছে।

(৭) আশ-শেফা অর্থাৎ আরোগ্যকারী। এই সুরা পাঠের দ্বারা সকল রোগ নিরাময় হয়। সকল ব্যাধির ইহা ধন্বন্তরী। দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব প্রকার ব্যাধির চিকিৎসার অব্যর্থ সন্ধান ইহার মধ্যে রহিয়াছে। ইহা মানুষের মনের সকল প্রশ্ন ও সন্দেহের নিরসন করে।

(৮) আর-রোককাইয়া অর্থাৎ পড়িয়া ফুঁ দিবার সুরা। রুগ্ন ব্যক্তির গায়ে এই সুরা পড়িয়া ফুঁ দিলে, সে রোগ-মুক্ত হয়। এক সাহাবী এক সাপে কামড়ানো ব্যক্তিকে এই সুরা পড়িয়া ফুঁ দেওয়ায় সে বিষমুক্ত হইয়া আরোগ্য লাভ করে। ইহা পাঠ করিলে শয়তান ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। রাবিয়া বসরী (রহঃ) বলিয়াছেন, সুরা ফাতেহা পড়িয়া যে কোন বিপদের সম্মুখীন হইলে, উহা কাটিয়া যায়।

(৯) সুরাতুল কান্‌য্‌ অর্থাৎ সম্পদের সুরা। আল্লাহ্‌তায়ালা রসুল করীম (দঃ)-কে বলিয়াছেন যে, ইহা তাঁহার আরশের সম্পদ রাজির মধ্যে অন্যতম। ইহার মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষার অফুরন্ত ধারা প্রবাহিত।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সারা জীবন ব্যাপিয়া সুরা ফাতেহার সাত আয়াতের তফসীর দ্বারা ইসলামের বিরোধী সকল জাতি ও দলের সকল আক্রমণের খণ্ডন এবং ইসলামের সত্যতা ও সকল ধর্মের উপর ইহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকাবলী হইতে সঙ্কলিত সুরা ফাতেহার ব্যাখ্যা ৩৮১ পৃষ্ঠার এক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

সুরা ফাতেহা সহ দশটি নাম এই সুরার মধ্যে বহুমুখী উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করিতেছে। এই সুরা কুরআন করীমের চাবি স্বরূপ। ইহার দ্বারা কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা উদঘাটিত হয়।

সার কথা এই যে, সুরা ফাতেহা যেন এক বিন্দু, যাহার মধ্যে জ্ঞানের অকুল সমুদ্রকে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

ফতুহা ও সপ্ত বজ্রধ্বনি

এই সুরার সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থেও ভবিষ্যদ্বাণী আছে। প্রাচীন গ্রন্থে ইহার দুই নাম যথা, ফতুহা ও সপ্তবজ্র। যোহনের প্রকাশিত বাক্য (ওহী) ১০ম অধ্যায়ে লিখিত আছে: "আমি এক শক্তিমান দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম; তিনি মেঘ পরিবেষ্টিত, তাহার মস্তকের উপর মেঘধনু, তাহার মুখ সূর্যের ন্যায়, তাহার চরণ অগ্নি স্তম্ভ সদৃশ, তাহার হস্তে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা "ফতুহা" (অর্থাৎ সুরা ফাতেহা) ছিল। তিনি তাহার দক্ষিণ চরণ সমুদ্রে ও বাম চরণ স্থলে রাখিলেন! তিনি সিংহ গর্জনের ন্যায় উচ্চ নাদে চীৎকার করিলেন। আর তিনি চীৎকার করিলে সপ্ত বজ্র নিজ নিজ স্বর ধ্বনিত করিল। সপ্ত বজ্র ধ্বনিত হইলে আমি লিখিতে উদ্যত হইলাম; আর স্বর্গ হইতে এক স্বর শুনিলাম, আমাকে বলা হইল: "ঐ সপ্ত বজ্রধ্বনি যাহা বলিল, তাহা মোহরাঙ্কিত (বন্ধ) করিয়া রাখ, লিখিও না। — — — — — — — — — — — — — — — আর বিলম্ব হইবে না; বরং যেদিন সপ্তম দূতের ধ্বনি শোনা যাইবে, তিনি যখন তুরী বাজাইবেন, তখন ঈশ্বর আপনার সেবক ভাব বাদীদের নিকট যেরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, সেইরূপ তাহার নিগূঢ় তত্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। — — — — — — পরে আমাকে বলা হইল, অনেক লোক সমাজ ও জাতি, ভাষা ও রাজার উদ্দেশ্যে তোমাকে আবার ভাববাণী বলিতে হইবে।"

উক্ত ওহীতে বর্ণিত শক্তিমান যে দূতের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, সুস্পষ্টতঃ তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ), যাঁহার নিকট সপ্ত আয়াত সম্বলিত সুরা ফাতেহা নাযেল হয়। মেঘের অর্থ আল্লাহ্তায়ালার রহমত এবং মেঘ পরিবেষ্টিত বলিতে তিনি আল্লাহ্তায়ালার রহমত পরিবেষ্টিত রহমতুল্লিল আলামীন। মেঘধনু মেঘের শোভা; ইহা আলোক-নিহিত সাত রঙের প্রকাশক। রুহানীয়তের স্তর সাতটি। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শিরে সাত রঙের শোভা তাঁহার ৭টি রুহানী স্তরের কামালাতের নির্দেশক। পবিত্র কুরআনে তাঁহাকে سِرَاجًا مُّنِيرًا প্রদীপ্ত সূর্য বলা হইয়াছে। উক্ত ওহীতে 'তাঁহার মুখ সূর্যের ন্যায়' কথাগুলি কুরআনী ভাষায় প্রদত্ত তাঁহার পরিচয়কে তসদীক করিতেছে। হযরত মুসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শরীয়ত অগ্নিবৎ হইবে। সুরা বকরের গোড়াতেই তাঁহাকে রুহানীয়তের অগ্নি প্রজ্জলনকারী বলা হইয়াছে, যাহার আলোকে সব কিছু দেখা যায় এবং পথ চলা যায়, অথচ কাফেরগণ যাহার ঔজ্জ্বল্যে অন্ধ হইয়া যায়। পা দিয়া মানুষ চলিয়া থাকে এবং শরীয়তের বিধান মানিয়া মানুষ ধর্ম পথে চলে। সুতরাং তাহার চরণ অগ্নিস্তম্ভের সদৃশ হওয়ার উল্লেখ দ্বারা তাঁহার শরীয়তের স্বরূপকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

পবিত্র কুরআনে তাঁহার আগমন কালে মানব জাতির অবস্থা প্রকাশ করিতে ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ 'জল ও স্থলে ফসাদ ছাইয়া গিয়াছে।' (সুরা রুম-৫ম রুকু)। জল বলিতে ঐশীগ্রন্থ-প্রাপ্ত জাতি এবং স্থল বলিতে ঐশীগ্রন্থ বিহীন জাতিকে বুঝায়। সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হইল গ্রন্থধারী ও গ্রন্থহীণ সকল জাতি তখন গুমরাহ হইয়া যাইবে এবং উভয় শ্রেণীর মানুষের জন্য তিনি পথ-প্রদর্শক হইয়া আসিবেন। এই কথাই "তিনি তাঁহার দক্ষিণ চরণ সমুদ্রে ও বাম চরণ স্থলে রাখিলেন" বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে। দক্ষিণ পদ পুরস্কার নির্দেশক এবং বাম পদ শাস্তি নির্দেশক। পবিত্র কুরআনে সুরা 'আল ওয়াকেআর' প্রথম রুকুতে দক্ষিণপন্থীগণকে পুরস্কৃত দল বলা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় রুকুতে বামপন্থীগণকে শাস্তি-প্রাপ্ত দল বলা হইয়াছে। অতএব এই বাক্যের অর্থ হইতেছে তিনি পাপী এবং পুণ্যাত্মাগণের পথ-প্রদর্শক হইবেন।

খ্রীষ্টান লেখকগণ সকলে একমত যে যোহনের উদ্ধৃত প্রকাশিত বাক্যের সহিত আগমনকারী মসিহের সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই বাক্যে উল্লেখিত ফতুহা শব্দ সুরা ফাতেহাকে নির্দেশ করিতেছে। একটি আরবী শব্দ এবং অপরটি ইব্রানী। উভয়ের একই অর্থ—উন্মুক্ত বা খোলা। এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে সুরা ফাতেহা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উপর নাযেল হইলেও, ইহার নিগূঢ় তত্বাবলী কিছু কালের জন্য লুক্কায়িত থাকিবে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইবে। আমরা সচক্ষে আজ ইহার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুরা ফাতেহার মধ্যে যে অফুরন্ত তত্বের ভাণ্ডার গুপ্ত ছিল, তিনি আসিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

সপ্তম দূত

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে আরও একটি বিশেষ কথা বলা হইয়াছে যে, সপ্তম দূত আসিয়া এই সকল তত্বাবলী অনেক লোক, সমাজ ও জাতি, ভাষা ও রাজার নিকট প্রচার করিবেন। এই সপ্তম দূত কে? আজ পরিস্থিতি ও প্রকাশিত ঘটনাবলী সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিতেছে যে, তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর নবুওতের তরীকায় সপ্তম রাশেদ খলিফা। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পর ৪ জন খোলাফায়ে রাশেদীন হইয়া ছিলেন। ইহার পর এ ধারা বন্ধ হইয়া যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতিচ্ছায়া রূপে আগমন করিয়া পুনঃরায় নবুওতের তরীকায় মোহাম্মদী উম্মতে খোলাফায়ে রাশেদীনের ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলিফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) হইলেন সপ্তম রাশেদ খলিফা বা প্রকাশিত বাক্যে উল্লেখিত সপ্তম দূত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) রাশেদ খলিফাকে রুহুল কুদ্দুস প্রাপ্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এই দূতের সম্বন্ধে যোহনের ভবিষ্যদ্বাণীতে আর একটি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। যথা— "সেদিন সপ্তম দূতের ধ্বনি শোনা যাইবে।" বস্তুতঃ এই খলিফার জন্মের পূর্বেই আল্লাহ্তায়ালা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-কে সুসংবাদ দিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে এক পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি, যে তোমার পৌত্র হইবে।" (হকীকাতুল ওহী পৃঃ ২১৮-১৯)। তাঁহার গৌরবোজ্জল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অপরাপর গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। তালমুদে বর্ণিত আছে He (Messiah) shall die and his Kingdom descend to his son and grandson. "মসিহের (স্বর্গীয়) রাজত্ব তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র পাইবে।" এই ভাবে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁহার আগমন ধ্বনি শোনা গিয়াছে।

এই সপ্তম দূতের সপ্ত বজ্র-ধ্বনি গর্জনের আর এক প্রকাশ আমরা এখন দেখিতেছি, যাহা তাঁহার পরিচয়কে সন্দেহাতীত করিয়া দিয়াছে। হযরত মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) আহমদীয়া জামাতের দ্বারা আগামী ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্বব্যাপী প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্যের প্রথম শত বার্ষিকী পালনের পূর্বায়োজনে যে প্রোগ্রাম ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করিয়াছেন, উহার মধ্যে সারা জামাতের পালনীয় কর্তব্য সমূহের মধ্যে অন্যতম হইল, সুরা ফাতেহা নামাযে যত বার পড়া হয়, তাহা ছাড়া দৈনিক অন্ততঃ সাতবার করিয়া এই সুরা মর্ম বুঝিয়া পাঠ করা। এই বিশেষ প্রোগ্রাম আজ দুই বৎসর হইতে চালু হইয়াছে এবং বর্তমানে দৈনিক বিশ্বের এক কোটি আহমদীর কণ্ঠ হইতে সপ্ত বজ্র ধ্বনি সপ্ত কোটিবার নিনাদিত হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত ও ক্রমঃবর্ধিত হইতে থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না যোহনের উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বিশ্বের শত শত ভাষাভাষি জাতি সমূহের মধ্যে ইসলাম প্রচারিত ও জয়যুক্ত হয়।

এই সুরার ফযিলত

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এই সুরা সম্বন্ধে জানাইয়াছেন: আমার ও বান্দার মধ্যে এই সুরাকে আমি সমানভাবে ভাগ করিয়াছি। ইহার সাহায্যে আমার বান্দা যে কোন দোওয়া করিবে আমি উহা কবুল করিব।" হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, এই সুরায় দোওয়ার যে সকল পন্থা বর্ণিত হইয়াছে, উহা পালন করিলে সকল দোওয়া কবুল হয়। এখন প্রশ্ন, পন্থা সমুহ কি? সুরার মযমুন হইতে দেখা যায় যে, ঐ গুলি হইল (১) بِسْمِ اللّٰهِ (২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (৩) اَلرَّحْمٰنِ (৪) اَلرَّحِيْمِ (৫) مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (৬) اِيَّاكَ نَعْبُدُ (৭) اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ। এই সুরা সাত আয়াতের এবং ইহার প্রথম দিকে উপরে ৭ দফা লিখিত আয়াত অংশ সমুহে দোওয়ার কবুলীয়তের সাত পন্থা বর্ণিত হইয়াছে।

দোয়ার কবুলীয়তের ৭টি পন্থা

(১) بِسْمِ اللّٰهِ "আমি আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি" বাক্যের মধ্যে বলা হইয়াছে যে, যে উদ্দেশ্যে দোওয়া করা হয়, উহা যেন নেক হয়। ইহা হইতে পারে না যে, চোর চুরি করিবার জন্য দোওয়া করে এবং উহা কবুল হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার নাম লইয়া তাঁহার সাহায্য চাহিয়া যে কাজের জন্য দোওয়া করা হয় উহা নিশ্চয় এমন হইতে হইবে, যাহাতে খোদা এবং বান্দা উভয়েই যেন শরীক হইতে পারে। খোদাতায়ালা পবিত্র। সুতরাং দোওয়া পবিত্র উদ্দেশ্যে, পবিত্র পন্থায়, পবিত্র কাজের জন্য হওয়া চাই। এই সংক্ষিপ্ত কথার দ্বারা দোওয়ার কবুলীয়তের সীমা সুস্পষ্ট হইবে। দেখা যায় অনেকে লোকের ধ্বংসের জন্য দোওয়া করে, কিন্তু উহা কবুল হয় না। ফলে তাহারা অভিযোগ করে যে, তাহাদের দোওয়া কেন কবুল হইল না। অনেকে নাজায়েয উদ্দেশ্যের জন্য দোওয়া করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া অভিযোগ করে তাহাদের দোওয়া কেন কবুল হইল না। অনেক ভণ্ড ও ছদ্মবেশী যাহেদ (সাধু) নাজায়েয উদ্দেশ্যের জন্য তাবিয দেয় ও দোওয়া করে, কিন্তু এ সবই নিষ্ফল হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার গুণ ও আইন বিরোধী কাজের জন্য দোওয়া কবুল হয় না।

(২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ "সকল (প্রকারের) প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, (যিনি) জগত সমূহের রব" আয়াতের মধ্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে, দোওয়া এমন হওয়া প্রয়োজন, যাহার ফলে আল্লাহ্‌তায়ালার অপরাপর বান্দাগণের, এমন কি সারা দুনিয়ার বান্দাগণের যেন মঙ্গল হয়। অন্ততঃ তাহাদের কাহারও যেন ক্ষতি না হয় ও আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা সাব্যস্ত হয় এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যেন কোন অভিযোগ উত্থিত না হয়।

(৩) اَلرَّحْمٰنِ "অযাচিত দানকারী" নাম দ্বারা আল্লাহতায়ালার অসীম রহমতকে আলোড়িত করা হয়। প্রার্থিত দোওয়া এমন হইতে হইবে যেন উহা কবুল হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার রহমানীয়তের গুণের প্রকাশ হয়।

(৪) اَلرَّحِيْمِ "বার বার করুণাকারী" নামের মধ্যে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, প্রার্থিত দোওয়া যেন আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতের গুণের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ উহা কবুল হইলে, উহার দ্বারা যেন এমন নেকীর ভিত্তি স্থাপিত হয়, যাহার প্রভাব দুনিয়ায় সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী হয় এবং উহার দ্বারা যেন নেক বান্দাগণ ধারাবাহিকভাবে উপকৃত হইতে থাকে। অন্ততঃ পক্ষে তাহাদের পথে যেন অন্তরায় সৃষ্টি না হয়।

(৫) مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ "বিচার সময়ের মালিক" বাক্যের মধ্যে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, দোওয়া করিবার সময় বাহ্যিক উপকরণ-সমূহের প্রতি যেন লক্ষ্য রাখা হয়। সঠিক ফল লাভের জন্য যে সকল বৈধ উপকরণ সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেগুলিকে যেন উপেক্ষা করা না হয়। কারণ, উপকরণগুলি আল্লাহ্তায়ালারই সৃষ্ট। তাঁহার নির্দেশিত পন্থা ছাড়িয়া তাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া বুদ্ধিহীনের কাজ। বস্তুতঃ দোওয়া করার সময় বাহ্যিক উপকরণ হস্তগত থাকিলে বা সহজলভ্য হইলে, উহার ব্যবহার দোওয়ার সঙ্গে অপরিহার্য। অবশ্য যদি উহা দুর্লভ হয়, তাহা হইলে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ সেফত উপকরণের উর্ধে উঠিয়া ফল প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে এই ইঙ্গিতও আছে যে, দোওয়া করিবার সময় অন্যদেরকেও যেন ক্ষমার চক্ষে দেখা হয় এবং নিজ হক আদায়ের উপর যেন খুব বেশী চাপ দেওয়া না হয়। কারণ সকল হকের অধিপতি একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা।

(৬) اِيَّاكَ نَعْبُدُ 'আমরা তোমারই এবাদত করি" বাক্যের মধ্যে এই নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে যে, প্রার্থনাকারীর যেন আল্লাহ্তায়ালার সহিত পূর্ণ এবং ঐকান্তিক সম্বন্ধ থাকে এবং সে শিরক্ এবং মুশরেকানা চিন্তাধারা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়।

(৭) اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ "আমরা তোমারই সাহায্য যাচনা করি" বাক্যের মধ্যে বলা হইয়াছে যে, প্রার্থনাকারী সম্পূর্ণরূপে খোদার হইয়া গিয়াছে এবং গয়ের আল্লাহ্র উপর হইতে তাহার দৃষ্টি অপসারিত হইয়া সে খোদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়াছে। যাহাই ঘটুক না কেন, চাহিতে হইলে সে কেবল খোদার নিকট চাহিবে। অপর কাহারও নিকট সে চাহিবে না।

উপরোক্ত সাতটি পন্থা অবলম্বন করিলে প্রার্থনাকারী খোদার নিকট যাহা চাহিবে, সে তাহাই পাইবে। এই প্রকার কামেল দোওয়ার নমুনা হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং তাঁহার কামেল অনুগামীগণ জগতকে দেখাইয়াছেন এবং তাঁহাদের দ্বারা কবুলীয়তের এমন নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে যে, অন্ধ চক্ষু লাভ করিয়াছে, বধির শ্রবণ-শক্তি লাভ করিয়াছে এবং বোবা বাক-শক্তি লাভ করিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুগমনের দ্বার কাহারও জন্য বন্ধ হয় নাই। যে কোন ব্যক্তি এই মর্যাদা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারে এবং সত্য সত্যই কবুলীয়তের মর্যাদা লাভ করিতে পারে।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) একদা সাহাবা (রাঃ আঃ)-কে কুরআনের সর্বাপেক্ষা বড় সুরা শিখাইতে ডাকিয়া সুরা ফাতেহা পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। সারা কুরআন সুরা ফাতেহার মযমুনের ব্যাখ্যা।

স্বপ্নে ব্যাখ্যা শিক্ষা

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, ছেলেবেলা একদা স্বপ্নে এক ফেরেস্তা তাঁহাকে সুরা ফাতেহার পূর্ণ ব্যাখ্যা শিখাইয়াছিলেন। জাগিয়া দেখেন তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখনই তিনি কোন বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন অথবা যখনই কোন পুস্তক রচনা করিতে বসিয়াছেন, তখনই এই সুরার নিত্য নূতন ব্যাখ্যা তাঁহার মস্তিষ্কে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফেরেস্তার শিখাইবার ধারা ও প্রকাশ এইরূপই হইয়া থাকে। তিনি জীবনব্যাপী সুরা ফাতেহার বহুমুখী ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনে যখনই কোন সমস্যা দেখা দিয়াছে, তিনি উহার সমাধানকল্পে সুরা ফাতেহার দর্পনে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে তিনি সমস্যার সমাধান পাইয়াছেন।

সুরা ফাতেহার নযুল

এই সুরা মক্কায় একবার এবং আর এক বার মদিনায় নাযেল হয়। ইহা প্রথম হইতেই প্রত্যেক নামাযে পঠিত হইয়া আসিতেছে।

সুরা ফাতেহার মযমুনের সার কথা

সুরা ফাতেহার নাম হইতে বুঝা যায় যে, ইহা কুরআন মজিদের ভূমিকা স্বরূপ। সারা কুরআন করীমের মযমুনকে ইহার মধ্যে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে, যেন পাঠক প্রথমেই মোটামুটিভাবে ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হইতে পারে।

১। এই সুরার প্রথমেই بسم الله বিসমিল্লাহ্ রাখা হইয়াছে। ইহাতে এই কথাই সুস্পষ্ট যে—একজন মুসলমান খোদাতায়ালার উপর আস্থা রাখে।

২। সে দার্শনিকদিগের ন্যায় শুধু ইহাই বিশ্বাস করে না যে, খোদাতায়ালা দুনিয়ার সৃষ্টির আদি কারণ, বরং সে ইহাও বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার সব কাজ তাঁহারই আদেশে ও নিয়ন্ত্রনে চলিতেছে। সুতরাং সুফল লাভের জন্য বান্দার প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য অপরিহার্য।

৩। আল্লাহ্তায়ালা কেবল এক আভ্যন্তরীণ শক্তি নহেন, বরং তাঁহার চিরস্থায়ী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং তিনি বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী, যেমন তিনি الرحمن আর-রহমান এবং الرحيم আর-রহীম।

৪। আল্লাহ্‌তায়ালা সকল উন্নতির উৎস এবং যে সকল উপকরণ দ্বারা দুনিয়ার মানুষ উন্নতি লাভ করে, উহা তাঁহারই করায়ত্ত। এই কথা আল্লাহ্‌তায়ালার গুণবাচক الرحمن আর-রহমান নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৫। আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে অশেষ উন্নতির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন সে আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা সৃষ্ট উপাদান সমূহের সদ্ব্যবহার করে, তখন তাহার কাজ শুভ ফলদায়ক হয় এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে উহা তাহাকে অধিকতর নেকীর ও পুরকারের অধিকারী করে এবং করিয়া চলিতে থাকে। তাঁহার আর-রহীম গুণবাচক নামের মাধ্যমে ইহা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৬। তাঁহার সকল কাজে ঐক্য ও কামাল বিদ্যমান। তিনি সকল সৌন্দর্যের অধিপতি এবং তিনি সকল প্রশংসার যোগ্য। কারণ তিনি ছাড়া আর যাহা কিছু সকলই তাঁহার সৃষ্ট। এই বিষয় আল-হামদোলিল্লাহে রাব্বেল আলামীন আয়াতের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

৭। আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতিরেকে আর কোন কিছু এমন নাই, যাহার আদি এবং অন্ত একই রূপের। তিনি সদা পূর্ণ। তিনি ব্যতিরেকে প্রত্যেক বস্তু তুচ্ছ অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়া নির্দিষ্ট পুর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং করিতেছে। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টি ও পালনকর্তা এবং অপর কেহই আপনা-আপনি অস্তিত্ববান নহে। একমাত্র তিনি রাব্বেল আলামীন।

৮। এই পৃথিবী বৈচিত্রময়। প্রত্যেক বৈচিত্রের বহু শাখা আছে এবং উহারা বহু প্রকৃতি বিশিষ্ট। কোন বস্তুকে বুঝিতে হইলে উহার জাতির প্রকৃতি কি, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। অন্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে চলিবে না। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক জাতির প্রতি উহার অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করেন। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুর মধ্যে যদি আল্লাহ্‌-তায়ালার ব্যবহারের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না। তারতম্য প্রয়োজনে এবং অবস্থা ভেদের কারণে ঘটে, যুলুম অথবা উপেক্ষার জন্য নহে। তাঁহার ربوبيت রবুবীয়তের তাকিদ ইহাই চাহে।

৯। আল্লাহ্‌তায়ালা যে সব বস্তুর দ্বারা কাজ গ্রহণ করেন, তিনি উহাদের যেরূপ সৃষ্টিকর্তা, তেমনি উহাদের উপাদান সমূহেরও তিনিই সৃষ্টিকর্তা।

১০। খোদাতায়ালা যেভাবে বস্তু এবং প্রয়োজনীয় ফল উৎপাদনকারী উপাদান সমূহের সৃষ্টিকর্তা, তেমনি কর্মফলও তাঁহার করায়ত্ত। যথা, আল্লাহ্‌তায়ালা যেমন মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই যে খাদ্য খাইয়া তাহার রক্ত উৎপন্ন হয়, উহাও তাঁহার আদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্বারা তাঁহার আর-রহীম গুণেরই প্রকাশ হয়।

১১। আল্লাহ্‌তায়ালা পুরস্কার ও শাস্তির এক নিয়ম নির্ধারিত করিয়াছেন অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী ভাল ও মন্দ কাজের সমষ্টিগত ফল একদিন প্রত্যক্ষ

করিবে। প্রত্যেক কাজের ফল দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যেমন অন্তর্বর্তী, যাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায় এবং চূড়ান্ত, যাহা সকল কাজের সমষ্টিগত ফল হিসাবে পরে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্তায়ালা কেবল এই ব্যবস্থাই করেন নাই যে, তাঁহার الرحيم আর-রহীম গুণের প্রকাশে প্রত্যেক কাজের এক সাক্ষাৎ ফল প্রকাশিত হয়, বরং তাঁহার مالك يوم الدين মালেক ইয়াওমিদ্দীন গুণের প্রকাশে সকল কাজের এক সমষ্টিগত ফলও প্রকাশিত হয়।

১২। সুতরাং যিনি এইরূপ স্বত্তা, তিনি উপাসনার যোগ্য এবং তাঁহার সহিত প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া কর্তব্য। اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বাক্যে এই স্বতঃসিদ্ধের কথাই উল্লেখিত হইয়াছে।

১৩। পুনঃ বলা হইয়াছে যে, মানুষের উন্নতি দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এক হইল দেহের আমল এবং অপরটি আত্মার আমল। আত্মার আমল হইল চিন্তা, ইচ্ছা ইত্যাদি। দেহের আমল হইল তাহার বাহ্যিক কার্যাবলী। উভয়েরই সংশোধন প্রয়োজন। ইহা আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য ছাড়া হইতে পারে না। এইজন্য اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ প্রার্থনা করা জরুরী।

১৪। অতঃপর اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বাক্যে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার সহিত বান্দার মিলনের এবং তাহার সংশোধনের স্বয়ং ইচ্ছা রাখেন। ইহার জন্য মাত্র এতটুকু প্রয়োজন যে, বান্দা যেন তাঁহার নিকট অবনত হয় এবং তাঁহার নিকট তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আবেদন জানায়।

(১৫)। অতঃপর صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বাক্যের মধ্যে বলা হইয়াছে যে, বাহ্যতঃ খোদাতায়ালাকে লাভ করার অনেক পথ দেখা যায়। কিন্তু কেবল পথ দেখা গেলেই চলিবে না, বরং ইহাও দেখিতে হইবে যে, ঐ পথ যেন সব চেয়ে ছোট হয়। মানুষ যেন আল্লাহ্কে পাওয়ার প্রচেষ্টায় ধ্বংস হইয়া না যায়। صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বাক্যে আবার বলা হইয়াছে যে, ঐ পথ যেন পরীক্ষিত পথ হয়, যে পথে চলিয়া মানুষ খোদাকে পাইয়াছে। এই পথের বিপদাপদ ও উহার প্রতিকার যেন জানা থাকে, যাহাতে বান্দা নৈরাশ্যে পতিত না হয় এবং যেন প্রশান্ত হৃদয়ে চলিতে পারে এবং তাহার উত্তম সঙ্গী লাভ হয়। এইরূপ পথ আল্লাহ্তায়ালার নিকট চাহিতে হয়।

(১৬)। উন্নতি লাভের ফলে মনে অহঙ্কার এবং আত্মশ্লাঘা জন্মিয়া মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়। সুতরাং এই দুর্ভাগ্য হইতে বাঁচিয়া চলা কর্তব্য। উন্নতিকে যুলুম এবং ফসাদের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করা উচিৎ নহে। বরং ইহাকে মানবতার খেদমত এবং নিরাপত্তার কাজে লাগানো উচিৎ। ইহার জন্য غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ দোওয়া করিতে থাকা উচিৎ।

(১৭)। মানুষ যেমন উন্নতিকে যুলুমের কাজে লাগায়, তেমনি সে অনুরাগে নাজায়েয প্রেমে পড়িয়া ক্ষুদ্র বস্তুকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে। ইহা হইতে আত্মরক্ষা করা এবং নেকী অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট وَلَا الضَّالِّينَ দোওয়া করিতে থাকা উচিৎ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(আমি) আল্লাহ্‌র নাম লইয়া (আরম্ভ করিতেছি), যিনি অযাচিত দানকারী, বার বার করুণাকারী। *

---

* শব্দার্থ ঃ—بِسْمِ শব্দ بَاء এবং اِسْمٌ এই দুই শব্দের সংযোগে গঠিত। بَاء শব্দের অর্থ 'সহিত' বা 'লইয়া'। কুরআনের প্রথম নযুলের সময় اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ আয়াত নাযেল হয়। ইহার অর্থ "পড়, তোমার রবের নাম লইয়া, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন"। যেহেতু হযরত রসুল করীম (সাঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পড়িতে জানেন না, সেই জন্য জিবরাইল (আঃ) এর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া যাইবার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক আয়াতের প্রথমেই 'পড়' বা "আবৃত্তি করিয়া যাও" আদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে 'পড়' শব্দে এই গ্রন্থ সদা পড়িবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার নাম রাখা হইয়াছে আল-কুরআন অর্থাৎ পাঠ্য। উল্লিখিত আয়াতের মর্মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই সুরা এবং প্রত্যেক সুরা আল্লাহ্‌র তিন গভীর অর্থবোধক নাম অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে। اِسْمٌ শব্দের অর্থ নাম, নিদর্শন, লক্ষণ অথবা উচ্চ হওয়া।

اللّٰهُ। সেই পবিত্র অস্তিত্বের নাম, যিনি অনাদি ও অনন্ত, চিরঞ্জীব ও জীবনদাতা, চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা এবং বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। আল্লাহ্ যেরূপ এক ও অদ্বিতীয়, اللّٰهُ। শব্দটিও তেমনি আরবী ভাষায় এক ও অদ্বিতীয়। ইহা কোন শব্দ হইতে উদ্ভূত নহে এবং ইহা হইতেও কোন শব্দ উদ্ভূত হয় নাই। ইহা কোন গুণবাচক বা বর্ণনাবাচক শব্দ নহে। ইহার বহুবচন নাই। ইহা সেই পবিত্র সত্তার জাতীয় নাম। অন্য কোন ভাষায় ইহার তুল্য কোন শব্দ নাই। অপর সকল ধর্মে ও ভাষায় আল্লাহ্র গুণ বা বর্ণনাবাচক নাম আছে এবং ঐ সকল নামের বহুবচনও আছে এবং স্ত্রীলিঙ্গও আছে।

اَلرَّحْمٰنُ শব্দ رَحْمٌ শব্দ হইতে فَعْلَانُ রূপের ওজনে উদ্ভূত। ইহার অর্থ ব্যাপক করুণার মালিক, যিনি স্বীয় অযাচিত করুণার দ্বারা বিশ্ব চরাচরের সব কিছু এবং প্রত্যেককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন এবং যিনি কর্মের বিনিময় ছাড়া এবং জীবন ও কর্মের পূর্বেই সকলকে অযাচিত ও ব্যাপক করুণার দানে ভূষিত করেন। এই গুণের প্রকাশে তিনি জীবনধারণের সকল উপকরণের ব্যবস্থা জন্মের পূর্বেই করিয়াছেন এবং মানব জাতির জন্য দৈহিক ছাড়াও আধ্যাত্মিক জরুরত পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালার এই নামের গুণের প্রকাশ ইহজগতে বিশেষভাবে মানব জাতির জন্য প্রকাশিত হওয়া নির্ধারিত হইয়াছে। তদনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালা اَلرَّحْمٰنُ রূপে আমাদিগের জন্ম ও কর্মের পূর্বেই আমাদিগের জীবন যাত্রা এবং জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অগণিত অযাচিত দানের সম্ভারে ইহজগতকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

তাঁহার আর-রহীম গুণ মোমেনগণের সুকর্মের নিত্য ও ক্রমঃবর্ধমান প্রতিদান-কল্পে পরলোকে তাহাদিগের জন্য অনন্ত সম্প্রসারণশীল আনন্দ সম্ভারে ভূষিত করিয়া যাইতে থাকিবেন। আর-রহমান-এর গুণ আমাদিগকে বিনা পরিশ্রমে ইহজগতে অগণণীয় অযাচিত দানে ভূষিত করিয়াছেন এবং আর-রহীম গুণ পরলোকে সুকর্মের ফলে আমাদিগকে অনন্ত সম্প্রসারণশীল দানে ভূষিত করিবেন। আর-রহমান শব্দ অযাচিত ও অগণণীয় দান নির্দেশক এবং আর-রহীম বদান্যতার সহিত অনন্ত কাল যাবৎ বার বার কর্মের পুরস্কার নির্দেশক। আর-রহমান শব্দ আল্লাহ্তায়ালার দানের জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং আর-রহীম শব্দ মানুষের দানের জন্যও ব্যবহৃত হয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,

اَلرَّحْمٰنُ رَحْمٰنُ الدُّنْيَا وَالرَّحِيْمُ رَحِيْمُ الْاٰخِرَةِ আর-রহমান, সাধারণতঃ এই দুনিয়া সম্পর্কিত এবং আর-রহীম পরলোক সম্পর্কিত।

তফসীর

পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সুরার মধ্যে সুরা বারায়াত (আত-তৌবা) ছাড়া বাকী প্রত্যেক সুরার ইহা প্রথম আয়াত। সুরা বারায়াত অবশ্য পৃথক সুরা নহে, বরং সুরা আনফালের পরিশিষ্ট। সেই জন্য উহার প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আয়াত সন্নিবেশিত হয় নাই। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, প্রথমে বিসমিল্লাহ্ আয়াত ছাড়া কোন সুরার নযুল তিনি জানেন না। (আবু দাউদ)। সুতরাং বিসমিল্লাহ্ আয়াত প্রত্যেক সুরার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুরা নহলের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ আয়াত ছাড়াও মধ্যে আর একবার ইহা মযমূনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আসিয়াছে, যেখানে সাবার রাণীকে হযরত সোলেমান (আঃ) যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহাতে এই আয়াত দ্বারা লিখা আরম্ভ করার উল্লেখ আছে। ফলে কুরআন মজিদে বিসমিল্লাহ্ আয়াত ১১৪ বার আসিয়াছে।

এই তফসীরের প্রথমেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, কুরআন মজিদ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে আউযু পড়িতে হয়। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, যখনই কুরআন মজিদ পড়িতে আরম্ভ করিবেন, তখন আউযু পড়িয়া লইবেন। কিন্তু যেখান হইতে পড়িবেন, সেখানে বিসমিল্লাহ না থাকিলে শুধু আউযু পড়িবেন এবং যেখানে বিসমিল্লাহ্ আছে সেখানে আউযের পর বিসমিল্লাহ্ পড়িবেন। নচেৎ নহে। একথা পূর্বেও একবার প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইয়াছে।

বিসমিল্লাহ্‌র ফযিলত

(১) হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বিসমিল্লাহ্ আয়াতের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিসমিল্লাহ্ ছাড়া কোন কাজ আরম্ভ করিলে উহা বে-বরকত হয়। সেই জন্য মুসলমানগণ প্রত্যেক কার্য আরম্ভ করিবার সময় বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে। এই আয়াতের মধ্যে এক মহান দোওয়া নিহিত আছে। সেই দো'ওয়া হইল, "হে আল্লাহ্। আমি তোমার নাম লইয়া এই কার্য আরম্ভ করিতেছি। তোমার اَلرَّحْمٰن (আর-রহমান) নামের নিকট আমি আবেদন করিতেছি যে, তুমি তোমার অযাচিত দানের গুণে আমার হস্তে ন্যাস্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দাও এবং উহার সদ্ব্যবহারের ফলে তোমার اَلرَّحِيْم (আর-রহীম) গুণে আমাকে আমার সুকার্যের ফল বদান্য হস্তে দান কর এবং বার বার দান কর।" পূর্ববর্তী নবীগণও আল্লাহ্‌র নাম লইয়া কাজ আরম্ভ

করিতেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা সোলেমান (আঃ)-এর পত্র লেখার ব্যাপারে উপরে বর্ণনা করিয়াছি। হযরত নূহ (আঃ) যখন তুফানের সময়ে কিস্তিতে আরোহণ করেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নাম লইয়া আরোহণ করেন এবং সঙ্গীগণকে আদেশ করেন اِرْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا পাঠ করিয়া কিশ্‌তিতে আরোহণ কর। "আল্লাহ্‌র নামে ইহার জল-যাত্রা হউক এবং (যাত্রাশেষে) ইহার নঙ্গর স্থাপনা হউক।"

(সুরা হুদ, ৪র্থ রুকু)।

২। পবিত্র কুরআন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কোষাগার স্বরূপ। আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতিরেকে ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ সম্ভব নহে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌-তায়ালা বলিয়াছেন لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থাৎ ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে, যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ এই কার্যের জন্য পবিত্র করিয়াছেন এবং নির্বাচিত করিয়াছেন, অপর কেহ কুরআনের তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে না। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا আল্লাহ্‌তায়ালা অনেকের জন্য কুরআন করীমকে হেদায়েতের কারণ করেন এবং অনেকের জন্য ইহাকে পথ ভ্রান্তির কারণ করেন। অর্থাৎ উভয়ের জন্য শব্দ ও বাক্যাবলী একই, কিন্তু ফল পৃথক হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন উঠে, মন্দ হইতে বাঁচিয়া ভাল ফল লাভ করিবার জন্য এবং পবিত্র কুরআনের তত্ত্ব বুঝিবার জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার উত্তর উপরেই আউযু পড়ার এবং প্রত্যেক সুরার প্রথমেই বিসমিল্লাহ্‌ পড়ার নির্দেশের মধ্যে দেওয়া আছে। অর্থাৎ কুরআন করীম পড়ার পূর্বে প্রথমেই শয়তানের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার দোওয়া চাহিয়া লও এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে তাঁহার রহমানীয়ত ও রহীমীয়তের দোহাই দিয়া তাঁহার সাহায্য লাভ কর, তাহা হইলে গুমরাহী হইতে বাঁচিয়া যাইবে এবং হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে।

৩। কুরআন করীমের প্রারম্ভেই বিসমিল্লাহ্‌ আয়াত রাখার উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন করীমের পাঠক তিন প্রকারের হইতে পারে। (ক) সে রিক্ত হস্ত ও সম্বলহীন, (খ) সে পাপে নিমজ্জিত হইয়া খোদাতায়ালার বিরাগ ভাজন হইয়াছে এবং তাঁহার ফযলকে আকর্ষণ করার কোন স্বাভাবিক উপায় দেখিতে পায় না, এবং (গ) সে ধর্ম-কর্মশীল হইতে পারে। এই তিন প্রকার মানুষের

মানসিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হইবে। প্রথম ব্যক্তি হয়রান, দ্বিতীয় নিরাশ এবং তৃতীয় ব্যক্তি অহঙ্কারে উদ্দীপ্ত। প্রথম ব্যক্তি হয়রান এই ভাবিয়া যে, সে কোথায় সত্যের সন্ধান পাইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিরাশ এই ভাবিয়া যে, কোন মুখে সে খোদার নিকট ক্ষমা চাহিবে। তৃতীয় ব্যক্তি অহঙ্কারে উদ্দীপ্ত এই জন্য যে, স্বীয় ধর্মকর্মের গরিমায় সে ভাবে যে, যাহা কিছু অর্জন করার ছিল, তাহা সে অর্জন করিয়া লইয়াছে। এই তিন প্রকারের চিন্তার প্রভাবে মানুষ কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং কুরআন করীমের প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্ রাখিয়া রিক্তহস্ত ও সহায়হীন ব্যক্তিকে পথ দেখানো হইয়াছে যে, সম্বলহীন ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য এক ও অদ্বিতীয় খোদা নিত্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, যিনি বান্দাকে অযাচিত দানে ভূষিত করেন। যে ব্যক্তি নাফরমানী করিয়া ক্ষমার দাবী হারাইয়াছে ভাবিয়া নিরাশ হইয়াছে, তাহাকে এই মন্ত্র বুকভরা সুনিশ্চিত আশা দিয়াছে যে, যে খোদা এই সুরা নাযেল করিয়াছেন তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, বান্দার যত বড় এবং যত অপরাধই হউক, ক্ষমা প্রর্থনাকারীকে তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে তিনি সদা প্রস্তুত। যে ব্যক্তি ধর্ম কর্মের আত্ম-চেতনায় অহঙ্কারী হইয়াছে, তাহাকে এই মন্ত্র সবক দিতেছে যে, খোদাতায়ালার রহমতের ভাণ্ডার অসীম, কোন এক মন্‌যিলে পা রাখিয়া ভাবিও না যে, যাত্রা শেষ করিয়া ফেলিয়াছ, বরং তোমার সম্মুখে সীমাহীন উন্নতির পথ সম্প্রসারিত। পাঠক এখন উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, এই প্রকারে পথ-ভ্রান্তগণের জন্য ভ্রান্ত ধারণার সংশোধনের পর কুরআন করীমের তত্ত্ব-সমূহ যে ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে, তাহা অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নহে। সুতরাং প্রত্যেক সুরার গোড়ায় বিসমিল্লাহ্ আয়াত রাখিয়া সর্বপ্রকার পাপী-তাপী ও পথ-ভ্রান্ত মানবকে কুরআন করীমের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করা হইয়াছে।

৪। এই আয়াতকে প্রত্যেক সুরার প্রথমে এই জন্য রাখা হইয়াছে যে, ইহা প্রত্যেক সুরার মর্ম উদঘাটন ও উপলব্ধির জন্য চাবি স্বরূপ। আমাদের যাবতীয় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণের জন্য আমাদের অভাব অভিযোগ সমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার দুইটি গুণ রহমানীয়ত ও রহীমীয়তের চারিদিকে সদা ঘুর্ণায়মান। আমাদের জীবনের সকল সমস্যার পূর্ণ সমাধানের জন্য আমরা সদা আল্লাহ্‌তায়ালার উক্ত দুই গুণের নিকট মুখাপেক্ষী। যেহেতু দুইভাবে ভুল ধারণা জন্মে, যথা কখনও বেশী ব্যাখ্যার দ্বারা এবং কখনও বাক্য সংক্ষেপের জন্য, সেই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ্ রাখিয়াছেন, যাহাতে কোন স্থানে অর্থ বুঝিতে সন্দেহ হইলে, পাঠক ইহার সাহায্যে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে পারে। যেখানে সন্দেহ ঠেকিবে, সেখানে অর্থ রহমান ও রহীম গুণের অনুযায়ী হইলে, উহাকে সঠিক বুঝিতে হইবে এবং বিরোধী হইলে, উহাকে ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই ভাবে প্রত্যেক

সুরা বিসমিল্লাহ্ আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং বিসমিল্লাহ্ আয়াত সুরার সঠিক ব্যাখ্যাকারী। এই প্রকারে উভয়ের সাহায্যে পাঠক নির্ভুল অর্থের সন্ধান পাইবেন।

ইহুদী ও খৃষ্টানগণ অপরাধী সাব্যস্ত

৫। তওরাত গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, বনি ইসমাইল বংশে মুসা (আঃ) এর অনুরূপ এক নবীর আবির্ভাব হইবে। তাঁহাকে মানিবার সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালার আদেশ—"আমার নাম লইয়া সে আমার যে সকল বাণী শুনাইবে, সেই সকল যাহারা শুনিবে না, আমি তাহাদিগের হিসাব গ্রহণ করিব।" (তওরাত—১৮ অধ্যায় ১৯ আয়াত)। এতদ্বারা প্রতিশ্রুত নবীর জন্য ইহাই নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল যে, তিনি যখনই আল্লাহ্র বাণী শুনাইবেন, তখনই তিনি আল্লাহ্র নাম লইয়া শুনাইবেন, নিজ পক্ষ হইতে নহে। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইহা জরুরী ছিল যে, পবিত্র কুরআনের প্রত্যেক সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ থাকিবে। বস্তুতঃ এইরূপেই রহিয়াছে। এতদ্বারা মুসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইল এবং অপর দিকে খ্রীষ্টানদের জন্য ইহা নিত্য সতর্কবাণী হইয়া রহিল। তাহারা এই ঐশীবাণীর প্রতি কর্ণপাত না করিলে মুসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাহারা আল্লাহ্তায়ালার শাস্তিতে নিপতিত হইবে।

৬। তওরাত গ্রন্থে লিখিত আছে, "কিন্তু যে নবী আমার নামে এমন কথা বলিতে সাহস করিবে যাহা আমি তাহাকে বলিতে আদেশ করি নাই, অথবা অন্য দেবতার নাম লইয়া বলিবে সেই নবী নিহত হইবে।" (তওরাত ১৮ঃ২০)। এই বাক্যে সতর্ক করা হইয়াছে যে, যে ব্যাক্তি আল্লাহ্তায়ালার নাম লইয়া মিথ্যা কথা বলিবে, আল্লাহ্তায়লা তাহাকে ধ্বংস করিবেন। এই সতর্কবাণীমুলক বিধানকে সম্মুখে রাখিয়া কুরআন করীমের প্রত্যেক সুরার গোড়ায় বিসমিল্লাহ্ রাখা হইয়াছে, যাহাতে খাস ভাবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ এবং সাধারণভাবে বাকি জগতবাসীর জন্য ইহা অকাট্য দলীল হয় এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সাফল্য এবং উন্নতি দেখিয়া প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নিশ্চিত ভাবে বুঝিতে পারে যে, তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, সব খোদার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি যখন খোদাতায়ালার নাম লইয়া সকল কথা বলিলেন, তখন তিনি (নাউযুবিল্লাহ) ধ্বংস হইলেন না কেন? সুতরাং বিসমিল্লাহ্য বাক্য ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সত্যতার অকাট দলীল। প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্ বাক্য হযরত রসুল করীম (সাঃ-এর সত্যতার সপক্ষে ১১৪ দলীল স্বরূপ এবং এতদ্বারা ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণকে ১১৪ বার অপরাধী সাব্যস্ত

করা হইয়াছে। কিন্তু যদি কোরআন করীমের গোড়ায় একবার মাত্র বিসমিল্লাহ্ আয়াত রাখা হইত, তাহা হইলে কুরআন করীমের সত্যতার দলীল এরূপ অকট্য ও অব্যর্থ হইত না।

বিসমিল্লাহ্‌র উল্লেখ পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে

কুরআন করীমের কোন কোন খ্রীষ্টান তফসীরকারক আপত্তি করিয়া থাকে যে, বিসমিল্লাহ্ বাক্য পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী হইতে নকল করা হইয়াছে। পারস্যদেশের জরথ্রুস্ত্রের গ্রন্থে আছে

بـنا م خدا و ند بخشا يند ٤ بخشا يش گـر

অর্থাৎ "খোদার নামে, যিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।" খ্রীষ্টান তফসীরকারকগণ আরও দাবী করে যে, ইহুদীরাও বিসমিল্লাহ্ বাক্যের ব্যবহার করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে ইহা আরবগণ নকল করে এবং তায়েফের আমীর ইহার ব্যবহার প্রচলন করে। কিন্তু খ্রীষ্টান তফসীরকারক রডওয়েল আরবদের মধ্যে এই শব্দের প্রচলনের কথাকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করিয়া দিয়াছে। কারণ আরবগণ আর-রহমান শব্দের বহুল ব্যবহারকে অপছন্দ করিত। যাহা হউক, এই কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকা চাই যে, তাহাদের মধ্যে বিসমিল্লাহ্ বাক্যের ব্যবহার এই আকারে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এরূপ প্রমাণ কোথাও নাই। পক্ষান্তরে ইহুদীগণের মধ্যে ইহার প্রচলন ছিল বলিতে যদি এই কথা বুঝায় যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনের নিকটবর্তী যুগে ইহুদীগণের মধ্যে ইহার প্রচলন ছিল, তাহা হইলে ইহা ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। তাহাদের মধ্যে ইহার কোন ব্যবহার ছিল না। বাকি থাকিল সাবার রাণীর নিকট সোলেমান (আঃ)-এর পত্রে এই আয়াতের ব্যবহার। ইহাতে কিছু আসে যায় না। ইসলামের এ দাবী নহে যে, আল্লাহ্, রহমান এবং রহীম শব্দত্রয় পূর্বে মানুষের জানা ছিল না। ইসলামের দাবী ইহাই যে, কুরআন করীমে বিসমিল্লাহ আয়াতের যে ভাবে সুদৃঢ় উদ্দেশ্য, তরতীব ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে ব্যবহার হইয়াছে, উহা ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই। জরথ্রুস্ত্রের পুস্তকে খোদার নাম লওয়া হইয়াছে, অথবা বিভিন্ন জাতির ধর্মপরায়ণ লোকের মধ্যে খোদার নাম লইয়া কাজ করার প্রচলন আছে, কিংবা সোলেমান (আঃ) সাবার রাণীর নিকট পত্র লিখিতে বিসমিল্লাহ্ আয়াতের ব্যবহার করিয়াছিলেন, এ সবের দ্বারা কুরআন করীমের অপূর্ব বিন্যাসে বিসমিল্লাহ্ আয়াতের ব্যবহারের মর্যাদা কোন দিক দিয়া ক্ষুণ্ণ হয়, না বরং এ সব ঘটনা কুরআন করীমের মাহাত্ম্যকে আরও বর্ধিত করে। কুরআন করীমের দাবী—আল্লাহ্‌তায়ালা সকল জাতির মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন (সুরা ফাতের, তৃতীয় রুকু)। অতএব নবী এবং বিভিন্ন জাতির ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র নাম লইয়া কাজ আরম্ভ করার প্রচলন কুরআন করীমের দাবীর সত্যতাকে সপ্রমাণিত করিতেছে। জরথ্রুস্ত্র (আঃ) যে ভাষায় খোদার নাম

লইয়াছিলেন, উহা তাঁহার পুস্তকে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার মন্ত্রে বিসমিল্লাহ্ আয়াতের মধ্যে নিহিত অর্থ, প্রযুক্তি ও তত্ত্বের দিক দিয়া বিশ অংশের একাংশও নাই। সোলেমান (আঃ) তাঁহার পত্রে বিসমিল্লাহ্ আয়াত ব্যবহার করিয়া থাকিলেও ইহার সন্ধান বাইবেল, তালমুদ, ইতিহাস বা কিম্বদন্তিতেও নাই। বহু যুগ পরে এ সংবাদ কুরআন করীমে আসিয়াছে। কুরআন করীমের দাবী অনুযায়ী উহাতে যে, সকল যুগের চিরস্থায়ী স্মৃত বা বিস্মৃত শিক্ষা-সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে, উক্ত বিষয় সমূহ তাহার জলন্ত প্রমাণ দিতেছে। (সুরা বাইয়েনাহ্) প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্র নাম লইয়া আরম্ভ করার জরুরত যে মানব জীবনে সর্বাগ্রগণ্য, তাহাতে ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না এবং চিরস্থায়ী শিক্ষার মধ্যে ইহা প্রথম স্থানীয়। কুরআন করীমই এই শিক্ষাকে যথাযোগ্য এবং কামেল রূপ দান করিয়াছে। এখানে আর একটি কথা স্মরণ রাখার যোগ্য। উহা এই যে, কুরআন করীমে শব্দ, বাক্য ও মজমুনের বিন্যাস স্বয়ং আল্লাহ্র। ইহার প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্য আল্লাহ্র। ইহা সর্বৈব কালামুল্লাহ্। অন্য কোন গ্রন্থের এই বৈশিষ্ট নাই। উহাদের মধ্যে আল্লাহ্র বাক্যও আছে এবং মানুষের বাক্যও আছে। ঐগুলি সব কেতাবুল্লাহ নামে অভিহিত, কালামুল্লাহ্ নহে। উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে রদবদল হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র কুরআন করীম আজও অবিকৃত, এবং আজও অগাগোড়া কালামুল্লাহ্।

বিস্‌মিল্লাহ্‌র মধ্যে ইসম শব্দ কেন বাড়ানো হইয়াছে?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, আল্লাহ্র সাহায্য লইয়া কুরআন পাঠ আরম্ভ করিতেছি বলা উচিৎ ছিল। উহার পরিবর্তে আল্লাহ্র নামের সাহায্য লইয়া আরম্ভ করিতেছি কেন বলা হইল? এখানে ইসম শব্দ কেন বাড়নো হইয়াছে? ইহার বিস্তারিত উত্তর নিম্নে দেওয়া হইল:

(১) قسم শব্দের অর্থ সাহায্য ছাড়া কসম খাওয়াকেও বুঝায়। সুতরাং বিল্লাহ বলা হইলে সন্দেহ জাগিতে পারিত যে, হয়ত আল্লাহ্র কসম খাইয়া আরম্ভ করিতে বলা হইয়াছে। তাহা হইলে ইহা অর্থহীন কথা হইত। তাই সন্দেহ ও বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ইসম শব্দ বাড়ানো হইয়াছে।

(২) আল্লাহ্তায়ালার সত্তা গুপ্ত। তাঁহার সত্তায় তিনি সৃষ্টির নিকট চির অজ্ঞাত ও চির অজ্ঞেয়। তাঁহার সত্তার পর্যায়ে তাঁহার সঙ্গীও হওয়া যায় না এবং তাঁহাকে মনন ও অনুসরণও করা যায় না। তাঁহার গুণের মাধ্যমে তাঁহার পরিচয় করা যায়। তাঁহার গুণকে মনন ও অনুসরণ করিয়া, তাঁহার আংশিক গুণে ভূষিত হওয়া যায়। কিন্তু কোন সময়েই তাঁহার পূর্ণ গুণের প্রতিবিম্ব হওয়া যায় না। কারণ তাঁহার গুণ অসীম ও অনন্ত। অবশ্য ক্রমঃবর্ধিত আকারে

তাঁহার গুণের প্রতিবিম্ব হওয়া যাইবে। এই জন্য এই আয়াতে আল্লাহ্র সহিত না বলিয়া আল্লাহ্র নামের সহিত বলা হইয়াছে এবং বিল্লাহ بالله না বলিয়া ইসম শব্দ বাড়াইয়া بسم الله বিসমিল্লাহ বলা হইয়াছে। আল্লাহ্ তাঁহার সত্তাবাচক নাম। ইহা ইসমে আযম বা মহানাম। কিন্তু যেহেতু এই নামে তাঁহাকে ধারণা ও মনন করা যায় না, সেই জন্য ইহার সহিত তাঁহার পরিচায়ক গুণবাচক আর-রমান এবং আর-রহীম নামদ্বয় সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, হে মহানামধারী আল্লাহ্! আমি তোমার রহমানীয়ত ও রহীমীয়তের অঞ্চল ধরিয়া তোমার নিকট সাহায্য কামনা করিতেছি। আমি তোমার গুণের সঙ্গী হইতেছি।

(৩) এতদ্বারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালার নামের মধ্যে আশিস রহিয়াছে। মানবের কর্তব্য সেদিকে মনোযোগ দেওয়া এবং উহার সাহায্যে সুফল লাভ করা।

(৪) কুরআন করীম এক বদ্ধ কোষাগার। যখন কেহ এরূপ কোন গৃহে প্রবেশ করিতে চাহে, যাহার মধ্যে মালীকের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ, তখন উহার রক্ষক অথবা উহাতে অবস্থানকারীগণকে মালীকের আদেশ বা অনুমতিপত্র দেখাইতে হয়। কিম্বা উহার উল্লেখ করিতে হয়, যেমন কোন পুলিশ কাহারও গৃহে প্রবেশ করিবার কালে বলে, আমি গভর্ণমেন্টের নামে প্রবেশ করিতেছি এবং অমুক মাল কব্জা করিতেছি। ফলতঃ এই ক্ষেত্রে নাম শব্দ বাড়াইয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া কুরআন করীম পড়িতে আরম্ভ করে, সে যেন কুরআন করীমের খেদমতে মোতায়েন ফেরেস্তাগণকে জানায় যে খোদাতায়ালা স্বয়ং আমাকে এই সুরা পড়িবার আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং আমার জন্য ইহার তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দাও। অন্য কথায় সে ইহাই জানায় যে, "আল্লাহ্, রহমান এবং রহীমের নামে এই কোষাগার আমার জন্য উন্মুক্ত করার আবেদন জানাইতেছি।" এই ভাবে যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সহিত কুরআন করীমের প্রতি মনোযোগী হইবে, সে পবিত্র কুরআনের জ্ঞানে ভূষিত হইবে। কিন্তু যে কুটিলতা ও বিদ্বেষ লইয়া কুরআন পাঠ করিবে, তাহার জন্য জ্ঞানের এই মহাভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে না।

(৫) উপরে "বিসমিল্লাহ্র ফযিলত" শিরোনামার অধীন "ইহুদী ও খৃষ্টানগণ অপরাধী সাব্যস্ত" শীর্ষক (৫) ও (৬) দফায় তওরাত গ্রন্থের যে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে, উহাতে রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণীই ছিল যে, তিনি আল্লাহ্তায়ালার সকল বাণী তাঁহার নাম লইয়া বলিবেন। উহার পূর্ণতার জন্য এবং

সেদিকে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং সারা জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এখানে ইসম অর্থাৎ নাম শব্দের প্রয়োগ জরুরী ছিল এবং তাহাই করা হইয়াছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সকল (প্রকারের) প্রশংসা আল্লাহ্‌র (ই) প্রাপ্য, (যিনি) জগত সমূহের রব। *

---

* শব্দার্থ: اَلْحَمْدُ যুক্ত শব্দের মধ্যে اَلْ শব্দের অর্থ সকল প্রকার (জানা বা অজানা) ও حَمْد শব্দের অর্থ প্রশংসা। ইহার কতকগুলি প্রতিশব্দ আছে। যথা شكر - ثنا - مدح (১) শোকর শব্দ যখন কোন মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ কোন উপকারের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক হইয়া থাকে। (২) সানা শব্দ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক বিষয়ের জন্য না হইয়া প্রচারণা-মূলক শ্রুত প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়। (৩) মদহ মিথ্যা প্রশংসাকেও বুঝায়, কিম্বা এমন কাজের জন্যও হইতে পারে, যাহাতে কর্মকর্তার কোন দখল ছিল না। হাম্‌দ শব্দ দ্বারা অনেক কিছু বুঝায়। ইহার দ্বারা সত্যিকার মঙ্গলময় সত্তার প্রতি তাঁহার অযাচিত ও যাচিত সদয় ব্যবহার ও দানের জন্য বিনয় ও নম্রতার সহিত অকৃত্রিম ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক এবং ভক্তি ও সম্মান প্রকাশক প্রশংসাকে বুঝায়। এই শব্দ আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া অন্য কাহারও প্রশংসায় ব্যবহৃত হয় না। এই শব্দের পূর্বে اَلْ যোগ করিয়া ইহার অর্থকে আরও গভীর এবং বহু ব্যাপক করা হইয়াছে। সুতরাং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্যের অর্থ হইল জানা অজানা সকল প্রকারের প্রশংসা এবং সকল মানুষের পক্ষ হইতে প্রশংসা পাইবার হকদার একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার। এখানে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রশংসা মানুষের জন্যও হইয়া থাকে। অতএব সকল প্রকার প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য বলা কিরূপে ঠিক হয়? এখানে لِلّٰهِ লিল্লাহ্ শব্দের মধ্যে لِ লাম মালিকানা স্বত্বকে বুঝায় অর্থাৎ মূলতঃ আল্লাহ্‌ই সকল প্রশংসার অধিকারী এবং গয়ের-আল্লাহ্ প্রশংসা পায় তাঁহার মাধ্যমে। কারণ মানুষ বা অন্যের মধ্যে যে প্রশংসার কথা পাওয়া যায়, সে সব তাহাদের নিজস্ব নহে, বরং আল্লাহ্‌র দেওয়া গুণ ও শক্তির ব্যবহারের ফলশ্রুতি। সুতরাং মানুষের যখন প্রশংসা করা হয় তখন ঐ প্রশংসারও একমাত্র অধিকারী আল্লাহ্‌তায়ালা। لِلّٰهِ শব্দে আল্লাহ্‌র পূর্বে লাম অক্ষরে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

رَبِّ শব্দের সাতটি অর্থ আছে। যথা: অধিপতি, প্রভু, পরামর্শদাতা, প্রতিপালক, চিরস্থায়ী ও স্থায়িত্বদাতা, মহান পুরস্কার দাতা এবং পরিসমাপ্তিকারী।

এই শব্দ যখন একক ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার দ্বারা একমাত্র আল্লাহ্তায়ালাকে বুঝায়। অন্য শব্দের সহিত ইহা মিলিত হইলে গয়ের-আল্লাহ্কেও বুঝায়। যেমন رَبُّ الْبَيْتِ অর্থাৎ বাড়ির মালিক।

العالمين আল-আলামীন—ইহা বহুবচন। একবচনে عالم আলম। ইহা علم এল্‌ম শব্দ হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ, 'সে ইহার উপর চিহ্ন বা নিদর্শন অঙ্কিত করিয়াছে'। العالم সর্বনাম, ইহার অর্থ হইল যদ্দারা কেহ কোন বস্তুকে চিনে। এই শব্দ সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে বুঝায়, যদ্দারা কেহ সৃষ্টিকর্তাকে জানিতে পারে। এই শব্দ কেবল সকল প্রকার সৃষ্ট জীব ও বস্তুকেই বুঝায় না, বরং তাহাদের জাতিকেও সমষ্টিগতভাবে বুঝায়। যেমন عالم الانس মানব জগত, عالم الحيوان প্রাণী জগত। العالمين শব্দ কেবল বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রাণী, মানুষ এবং ফেরেস্তাকে বুঝায় না, বরং সকল প্রকার সৃষ্ট বস্তু ও প্রাণীকেও বুঝায়। এই শব্দ কখনও কখনও কেবল মানব জগত অথবা সমসাময়িক মানব জাতিকে বুঝায়। বর্তমান ক্ষেত্রে العالمين শব্দ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে সকল প্রকার সৃষ্ট বস্তু ও জীবকে বুঝাইতেছে।

তফসীর

الحمد لله বাক্যে ইহা বলা হয় নাই যে আমি বা আমরা প্রশংসা করিতেছি বরংস বলা হইয়াছে যে সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্র। আমি বা আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা করিতেছি বলিলে أَحْمَدُ لِلّٰهِ বাক্য ব্যবহৃত হইত। উহাতে প্রশ্ন উঠিত আমি বা সকল মানুষ কি আল্লাহ্তায়ালাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছে বা করিতে পারে? আমরা সসীম ও অপূর্ণ জ্ঞান লইয়া সেই পূর্ণ অসীমের কতটুকু প্রশংসা জানি ও করিতে পারি? আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রকাশ ক্ষমতার সীমার মধ্যই প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু ইহার বাহিরে আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসার অসীম ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং সঠিকভাবেই الحمد لله "সকল প্রকারের প্রশংসা আল্লাহ্র" বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বাক্য কর্তৃবাচ্য ও কর্ম বাচ্য উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কর্তৃবাচ্যে ইহার অর্থ হইবে কাহাকেও যথাযোগ্য প্রশংসায় ভূষিত করিবার অধিকার একমাত্র আল্লাহর রহিয়াছে। অন্য কেহ সসীম জ্ঞান লইয়া ইহা করিবার অধিকারী নহে। কর্মবাচ্যে ইহার অর্থ হইবে মৌলিকভাবে সকল প্রকার প্রশংসার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ্তায়ালা। অপর বস্তু বা ব্যক্তির প্রশংসা ধার করা ও গৌণ। প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তির গুণ বা শক্তি সকলই আল্লাহ্তায়ালার দেওয়া। সুতরাং তাহাদের প্রশংসা গৌণ, পক্ষান্তরে মৌলিক প্রশংসা কেবল আল্লাহ্তায়ালার।

সুতরাং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ হইবে :—

(১) বিশ্বের সৃজনকর্তা ও মালিক আল্লাহ্, সকল দোষ ও ত্রুটি হইতে পবিত্র এবং সকল গুণ ও সৌন্দর্যের অধিপতি।

(২) তিনি সকল বস্তুর স্বত্বা ও গুণ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। প্রাণী ও বস্তু নিচয়ের গবেষণাকারীগণের নিত্য নূতন তথ্যের আবিষ্কার প্রমাণ করিতেছে যে মানুষের জ্ঞান কত সামান্য।

(৩) আল্লাহ্তায়ালা তখনই সকল প্রশংসার অধিকারী হইতে পারেন, যখন তিনি সারা বিশ্বের রব হয়েন। নচেৎ তিনি সকল প্রশংসার মালিক হইতে পারেন না। সুতরাং ইহা জরুরী যে প্রাকৃতিক জগত যেভাবে সকলের সেবায় নিয়োজিত, তাঁহার আধ্যাত্মিক জগতও সেইভাবে সকলকে উপকার পৌঁছায় এবং কোন দেশ বা জাতি আধ্যাত্মিক উন্নতির উপকরণ হইতে বঞ্চিত থাকিবে না। সুতরাং কোন এক জাতি যদি ওহী ইলহামের সম্পদে ভূষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য জাতির জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। প্রাগ-ইসলামিক যুগে এইরূপই হইয়াছে। কিন্তু কোন এক সময়ে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জাতির নিকট ওহী প্রেরণ বন্ধ করিয়া যদি একটি মাত্র বিধান প্রেরণ করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিধানকে সার্বজনীন হইতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি সমষ্টিগতভাবে সারা বিশ্বের রব এবং সকল প্রশংসার মালিক হইতে পারেন না। পক্ষান্তরে তিনি সারা বিশ্বের রব হওয়ার কারণে তাঁহার এক সার্বজনীন বিধান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ ইসলাম সেই ধর্ম, যাহা সারা বিশ্বের জন্য। ইহা আরবের জন্য নহে, ইহা আজমের জন্য নহে, ইহা প্রাচ্যের জন্য নহে, ইহা প্রতীচ্যের জন্যে নহে, ইহা ইহুদী, খ্রীষ্টান, হিন্দু কোন বিশেষ এক জাতির জন্য নহে, ইহা কোন বিশেষ এক যুগের জন্য নহে, বরং ইহা সর্বদেশ, সর্বজাতি এবং সর্বকালের জন্য। ইহা সকল যুগের সকল দেশের সকল মানবের জন্য সমান সুযোগ ও কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং কোন জাতি যদি মনে করে যে ওহী লাভ একমাত্র তাহাদের জাতিগত অধিকার, তাহা হইলে তাহারা মহা ভ্রমে নিপতিত রহিয়াছে এবং সেরূপ হইলে আল্লাতায়ালাকে বিশ্বের রব না বলিয়া বরং কোন জাতি বিশেষের রব বলিতে হয়। এখন যখন সারা দুনিয়া যোগাযোগের ব্যবস্থার দ্বারা এক গৃহে এবং সকল মানুষ এক গোষ্ঠিতে পরিণত হইয়াছে, তখন কোন জাতিগত বিধান লইয়া কিভাবে সকল জাতি ও জগত চলিতে পারে? এখনও কি কাহারও বুঝিতে বাকি থাকা উচিৎ যে, এখন বিশ্বে এমন এক সার্বজনীন ধর্মীয় বিধানের প্রয়োজন, যাহা সকল দেশ এবং সকল জাতিকে শান্তির একই চন্দ্রাতপতলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া জীবনকে সহজ ও সুন্দর করিয়া দেয়? সার কথা এই যে,

আল্লাহ্ যখন বিশ্বের এক এবং অদ্বিতীয় রব, তখন বিশ্ব-মানবের জন্য এক ও অদ্বিতীয় সার্বজনীন বিধানের প্রয়োজন এবং উহা এমন হওয়া চাই যদ্বারা তাঁহার প্রশংসা এবং প্রশংসাই হয়।

الحمد لله رب العلمين আয়াতের মধ্যে কুরআন করীমের নযুলের এই উদ্দেশ্যই বর্ণিত হইয়াছে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীও করা হইয়াছে যে, সময় আসিতেছে যখন এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে, সকল জাতি তথা সমগ্র মানব জাতি মিলিত কণ্ঠে আল্লাহ্তায়ালার প্রশাংসা গীতি গাহিবে, এবং এই আয়াতের মর্ম সত্যে পরিণত হইবে।

(৪) সকল শক্তি ও বৃত্তি দ্বারা মানব ভূষিত হইয়াছে। সকলই আল্লাহ্র দান হওয়ার কারণে মানুষের সকল ভাল কাজের জন্যও প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালারই প্রাপ্য।

(৫) "জগত সমুহের রব" কথাগুলির সহিত "সকল প্রসংশা আল্লাহ্র" বাক্য সংযুক্ত করিয়া আল্লাহ্তায়ালা আমাদের দৃষ্টি এই বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন যে, সত্যিকার ভাবে মানুষের তখনই খুশী হওয়া উচিৎ, যখন আল্লাহ্তায়ালার "বিশ্বের রব" গুণের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সকলেই যেন সুখ ও শান্তির অধিকারী হইয়া একযোগে আল্লাহ্তায়ালার গুণ গান করিয়া উঠে। যে ব্যাক্তি নিজের কল্যাণে খুশী হয় ববং অন্যদের ক্ষতির প্রতি দৃকপাত করে না, সে ইসলামের শিক্ষাকে বুঝে নাই। সত্যিকার আনন্দ ইহাতেই যে, সকলে আনন্দ লাভ করুক। সুতরাং মোমেনের জন্য কর্তব্য যে, সে শুধু নিজের মঙ্গলই দেখিবে না, বরং সারা বিশ্বের মঙ্গল কামনা করিবে। যে ইহা না করে, সে ইসলামের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে নাই এবং ইহার বিশ্বজনীন রূপকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সকলের আনন্দেই মোমেনের আনন্দ।

(৬) رب العلمين বাক্য নির্দেশ করিতেছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া প্রতিটি বস্তু ও প্রাণী রবুবীয়তেরর মুখোপেক্ষী। অর্থাৎ সব কিছু ক্রমঃবিকাশের নিয়মের অধীন। দুনিয়ায় এমন কোন বস্তু নাই যাহার আদি এবং অন্ত এক আকারের। এক মাত্র আল্লাহ্তায়ালার সত্তা সদা পূর্ণ, বাকি সব কিছুই পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক বস্তু নগণ্য অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থার দিকে গতিশীল। ইহা দ্বারা দুইটি বিষয় সাব্যস্ত হয়। প্রথমতঃ— আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই সৃষ্ট। কারণ যাহার পরিবর্তন ও উন্নতি আছে, উহা নিজ হইতে অস্তিত্বে আসিতে পারে না। দ্বিতীয়টি হইল—ক্রমঃবিকাশের নিয়ম সঠিক ও চিরন্তন। মানুষ হউক বা জীব, উদ্ভিদ হউক বা জড় বস্তু, সকলেই স্বতন্ত্র-ভাবে নগণ্য অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থার দিকে গতিশীল। রব্বেল আলামীনের অর্থ ইহাই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুকে ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর অবস্থার দিকে উন্নীত করিয়া পূর্ণতা দেন। আমরা বিশ্বের সর্বত্র ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

(৭) উক্ত বাক্যের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, ক্রমঃবিকাশ বিভিন্ন সময় এবং স্তরে ঘটিয়া

থাকে। কারণ রব শব্দের অর্থ ইহাই যে, তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্তর পার করিয়া প্রত্যেক বস্তুকে উহার পূর্ণতায় পেঁাছান।

(৮) আরও বুঝা যাইতেছে যে ক্রমঃবিকাশের নিয়ম আল্লহ্তায়ালার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস আনার বিরোধী নহে। কারণ প্রতিটি বস্তু ক্রমঃবিকাশের নিয়মে প্রতি মূহূর্তে আল্লাহ্-তায়ালার প্রতিপালনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বকে খণ্ডন করিতেছে না বরং তাঁহার প্রশংসাকে সাব্যস্ত করিতেছে। এই জন্যই রাব্বেল আলা-মীনের সহিত আলহামদুলিল্লাহ্ শব্দ সংযুক্ত করা হইয়াছে।

(৯) এই আয়াত আরও নির্দেশ করিতেছে যে, মানুষকে সীমাহীন উন্নতির জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সকল প্রকারের প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এই কারণে বলা হইয়াছে যে, তিনি বিভিন্ন সৃষ্ট বস্তুকে নগণ্য অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থার দিকে পেঁাছাইয়া থাকেন। এখন যদি প্রত্যেক স্তর এবং মর্যাদার উর্ধে আরও স্তর ও মর্যদা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার প্রশংসা এইখানে আসিয়া আটক হইয়া যায়. আর আগে বাড়ে না। সৃষ্টির প্রত্যেক স্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানব জীবন ছাড়া বিশ্বের প্রত্যেক শ্রেণীর বস্তু ও প্রাণীর জন্য ক্রমঃবিকাশের ধারা এক নির্ধা-রিত স্থানে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণীর জন্য সীমাবদ্ধ জীবনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। উহার উর্ধে তাহারা উঠিতে পারে না। কিন্তু মানুষের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটি-য়াছে। ক্রমঃবিকাশের নিয়ম মানবের দৈহিক কাঠামোকে চরমত্ব দান করার পর উহার গতিপথ তাহার দেহকে ছাড়িয়া তাহার বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। মানব ছাড়া আর কাহারও জন্য এ ব্যবস্থা নাই। সৃষ্টির আদিতে তাহাদের উন্নতির ধারা যেখানে শেষ হইয়াছিল আজও সেই খানেই শেষ হয়। কিন্তু মানব সতত উন্নতিশীল। তাহার কর্ম-জীবনের পরিধি সদা সম্প্রসারণশীল এবং তাহা সীমাহীন। পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে প্রগতিধারা তাহার জীবনে অব্যাহত গতিতে প্রবাহমান। সুতরাং মানব জীবনে ক্রমঃবিকাশের সদা অগ্রগতিশীল ধারা আল্লাহ্তায়ালার জন্য সকল প্রকার প্রশংসার ধারাকে সদা সম্প্রসারণশীল করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার রবুবীয়তের প্রকাশ যেমন ব্যাপ্তিতে সীমাহীন তেমনি ক্রমঃবিকাশেও সীমাহীন। অতএব ক্রমঃবিকাশের ধারা আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বে বিশ্বাস আনার বিরোধী না হইয়া বরং আল্লাহ্তায়ালার রবুবীয়তের দ্বারে চিন্তাশীল মানবকে কৃতজ্ঞচিত্ত ও প্রশংসারত রাখিয়াছে। এই জন্য রাব্বেল আলামীন শব্দের সহিত আলহামদুলিল্লাহ্ শব্দ সংযোযিত রহিয়াছে।

(১০) কুরআন করীমের এই প্রথম সুরায় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

রাখিয়া আল্লাহ্তায়ালা জানাইয়াছেন যে, এখন তাঁহার কামেল প্রশংসা আরম্ভ হইবে। ইসলাম, যাহা রাব্বেল আলামীন গুণের পূর্ণ বিকাশস্থল, সকল মানবের জন্য আসিয়াছে এবং জীবন যাত্রার তাকিদ দিয়া মানব জাতিকে যেমন বাহ্যিক ভাবে একত্রিত করা হইয়াছে, তেমনি এখন ইহার দ্বারা তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবে একত্রিত করা হইল।

শান্তিপুর্ণ সহ অবস্থানের জন্য এ বিধান তাহাদিগকে মানিতে হইবে। এতদিন বিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থিত মানবের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন রসুল প্রেরিত হই-য়াছে। তখন তাহারা একে অপরের নবী ও ধর্মকে মিথ্যা ও ভ্রান্ত বলিত। ইসলামের আবির্ভাবে সারা দুনিয়ার জন্য এখন এক ধর্ম হইয়া গিয়াছে - ফলে আরবী, হিন্দুস্থানী, চিনি, মিশরী, ইরাণী, পাশ্চাত্য ও প্রতিচ্যবাসী সকলেই এক আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসায় নিয়োযিত হইল এবং সকলেই ইহা উপলব্ধি করিল যে, বিভিন্ন জাতির খোদা পৃথক নহেন, বরং সকল জাতির খোদা এক। আল্লাহ্তায়ালা যখন তাঁহার অপার অনুগ্রহে এইভাবে আপন রবুবীয়তের চাদরে সকলকে আবৃত করিয়া পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ভাবে একত্র করিয়া দিলেন, তখন স্বতঃই ব্যক্ত ও অব্যক্ত, বর্ণনীয় ও অবর্ণনীয় সকল প্রকার প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য হইয়া গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বাক্যের মর্মকথা ইহাই।

অযাচিত দানকারী, বার বার করুনা কারী। اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০

শব্দদ্বয় ইতিপূর্বে সুরার প্রথমেই بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আয়াতের মধ্যে একবার আসিয়াছে। সেই জন্য কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকে যে, দ্বিতীয় আয়াতের পরেই এই শব্দদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি করা হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, بسم الله الرحمن الرحيم আয়াতে এক স্থায়ী মযমুন বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা প্রত্যেক সুরার চাবিস্বরূপ। সুতরাং সুরার প্রারম্ভে আল্লাহ্তায়ালার আলোচ্য দুই নামের পুনরাবৃত্তি চর্বিত চর্বণ নহে, বরং স্বাভাবিক এবং জরুরী। রাব্বেল আলামীন শব্দের মধ্যে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ-তায়ালা প্রত্যেক বস্তুকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উন্নতি দিয়া পূর্ণতা দান করেন। আলোচ্য الرحمن الرحيم আয়াতের মধ্যে রবুবীয়তের পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে।

এই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালার রবুবীয়তের প্রকাশের দুই ধারার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। যথা রহমানীয়ত ও রহীমীয়ত।

(১) আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর জন্য এরূপ উপকরণ সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন,

যে সমুদয় উহার উন্নতির সহায়ক এবং তিনি এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপদান সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন, যদ্বারা উহার প্রচ্ছন্ন হইতে প্রচ্ছন্নতর শক্তি নিচয়কে প্রকাশিত করিতেছে। মানুষ, প্রাণীকূল, উদ্ভিদ ও বস্তু সমূহ পারিপার্শ্বিক উপকরণ ও উপদান সমূহ হইতে নিজ নিজ জরুরত অনুযায়ী স্থায়ীত্ব ও উন্নতির জন্য সাহায্য সঞ্চয় করিয়া যাইতেছে। ইহা রহমানীয়তের (অর্থাৎ অযাচিত দানের) গুণের অধীনে ঘটিতেছে।

(২) যখন কোন মানুষ নিজ দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করে, তখন তাহার কার্যের মর্যাদা করা হয়, তাহার উপর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করা হয় এবং আরও উন্নতির জন্য তাহার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা হয় এবং তাহাকে সীমাহীন উন্নতির পথে পরিচালিত করা হয়। ইহাতে আল্লাহ্তায়ালার রহীমীয়তের গুণের প্রকাশ ঘটিতেছে।

কাফ্ফারার খণ্ডন

الرحمن শব্দ আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও জন্য ব্যবহৃত হয় না। অপপ্রয়োগের কথা পৃথক, যেমন মুসায়লেমা কায্যাব নিজেকে ইয়ামামার রহমান বলিত। الرحمن এর অর্থ যিনি হক না থাকিলেও অযাচিত দান করিয়া থাকেন। এই শব্দের মর্মে কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্তবাদের খণ্ডন রহিয়াছে। কারণ প্রায়শ্চিত্তবাদের ভিত্তি হইল আল্লাহ্তায়ালা সরাসরি বিনা দণ্ডদানে কাহারও পাপ ক্ষমা করিতে পারেন না। খ্রীষ্টানগণ, বিশেষতঃ আরবের খ্রীষ্টানগণ এ ব্যাপারে এরূপ সচেতন যে তাহারা কোন রচনা বা পত্রাদি লিখার সময় আল্লাহ্র নাম লইতে হইলে তাহারা রহমান শব্দটি এড়াইয়া চলে। যাহাদের উপর ইসলামের প্রভাব আছে, তাহারা লিখিবে بِسْمِ اللهِ الْكَرِيْمِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহেল করীমের রহীম। অথবা আল্লাহ্তায়ালার অন্য কোন গুণবাচক নাম ব্যবহার করিবে। তাহারা ভুলিয়াও রহমান শব্দ ব্যবহার করে না। কারণ তাহারা মনে মনে বুঝে যে খোদা-তায়ালা রহমান হইলে, তিনি মসীহের কাফ্ফারা না লইয়াই বান্দার পাপ ক্ষমা করিতে পারেন। ইহাতে তাহাদের মনগড়া ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু সত্য কথা, বরং বড় সত্য এই যে, আল্লাহ্তায়ালা রহমান। সারা সৃষ্টি এই 'না চাহিতে দানের' ভিত্তিতে খাড়া হইয়াছে ও রহিয়াছে। এই নামের ক্রিয়াকে বাদ দিলে সারা সৃষ্টি মুহূর্তে লয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। যিনি এইরূপ অসীম অযাচিত দানের অধিপতি, তাহার জন্য বিনা দণ্ডে বা বিনা কাফ্ফারায় বান্দার অপরাধ ক্ষমা করা কতই না তুচ্ছ। নবীগণের আগমনে তাঁহাদের অনুসরণকারীগণের পূর্ববর্তী অপরাধভরা জীবন আল্লাহ্তায়ালার রহমানীয়তের সেফাতে ক্ষমার ফলে তাহাদের পরবর্তী পরিবর্তীত, পবিত্র ও প্রাতঃস্মরণীয় জীবন অপূর্ব নযীর

হিসাবে যুগ যুগের ইতিহাস রচনা করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যে الرحمن তাহার অকাট্য সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার জন্য কোন কাফ্‌ফারার প্রয়োজন হয় নাই। শুধু অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল।

পূণর্জন্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের খণ্ডন

আর-রহীম সেফাতের মধ্যে পূণর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদের খণ্ডন রহিয়াছে। সীমাবদ্ধ সৎ-কর্মের দ্বারা সীমাহীন প্রতিদান লাভ করা অসম্ভব, এই ধারণার ভিত্তিতেই পুণর্জন্ম-বাদের সৃষ্টি। আর-রহীম সেফাত ইহা প্রকাশ করে না যে সীমাবদ্ধ কর্ম সীমাহীন পুরস্কার আনে, বরং ইহার অর্থ এই যে, প্রত্যেক কাজের স্বভাব হইল বারম্বার প্রত্যাবর্তিত হওয়া। সুতরাং ইহার ফলে পুরস্কারও বারম্বার লাভ হইতে থাকে। রহীম শব্দ বার বার অনুগ্রহ করাকে বুঝায়। বার বার অনুগ্রহ করার এ অর্থ নহে যে, একটি কাজের জন্য বার বার পুরস্কার লাভ হয়। বরং ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মের হকীকত বুঝিয়াছে, সে বার বার সৎকর্ম করে। অন্ততঃপক্ষে তাহার অন্তরে বার বার সৎকর্ম করার আকাঙ্খা সুনিশ্চিতভাবে জাগিতে থাকে এবং যতই সে সৎকাজ করার সুযোগ লাভ করে, ততই তাহার সৎকর্ম করার ক্ষমতা ও আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহার ফলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার প্রতি আরও অনুগ্রহ করেন এবং বান্দার সৎকাজ করার আগ্রহ, ক্ষমতা ও সুযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সমান্তরাল ভাবে তাহার উপর আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহও বার বার নাযেল হইতে থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার রহম কেবল অতীত কর্মের পুরস্কার দানেই সীমাবদ্ধ নহে, বরং ভবিষ্যত নেকীর জন্য বীজেরও কাজ দেয়। যেমন আম বা অপরাপর ফলের বীজ উহার রোপনকারীকে একটি গাছ দিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উহা সহস্র সহস্র আম বা ফল উৎপাদন করে এবং বারবার পরিপক্ক আমগুলি আমাদিগকে শাঁস দিয়া সহস্র গাছের বীজ দিয়া যায়।

বস্তুতঃ সীমাবদ্ধ কর্মের ধারণা হিন্দুদের মধ্যে এই জন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহারা জান্নাত বা স্বর্গকে এক কর্মহীন জায়গা বলিয়া মনে করিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, তাহারা নাজাত বা মুক্তি বলিতে নির্বানকে বুঝায় অর্থাৎ সকল প্রকার ইচ্ছা ও কর্মের বাঁধন হইতে মুক্ত হওয়া। সুতরাং তাহাদের মতানুযায়ী এই জীবনেই কর্মের অবসান হয়। এইরূপে কর্ম সম্বন্ধে তাহারা সীমাবদ্ধ ধারণা রাখে। যেহেতু তাহাদের ধারণানুযায়ী কর্ম সীমাবদ্ধ, অতএব উহার পুরস্কারও সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। কিন্তু ইসলাম বার বার রহম এবং কর্মের মতবাদ পেশ কেরিয়াছে এবং জান্নাতকে কর্মস্থল নির্ধারণ করিয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা রাব্বেল আলামীন, সুতরাং জান্নাতও এক জগত এবং

সেখানেও মানুষ উন্নতি করিবে। নচেৎ আল্লাহ্‌র রাব্বেল আলামীন নাম সত্য হয় না। মানুষ যখন জান্নাতেও উন্নতি করিবে, তখন তাহার তকওয়া এবং ঐশী প্রেমও উন্নতি করিবে। যখন এই সকল বিষয়ে সে উন্নতি করিবে, তখন তাহার কর্মের ফলশ্রুতিতে তাহার উপর আল্লাহ্‌তায়ালার রহম আবার নাযেল হইবে। যখন কর্ম ও রহমের চক্র এই ভাবে গতিশীল থাকিবে, তখন মুক্তির সময় সীমাবদ্ধ কেমন করিয়া হইবে? ইহলোক এবং পরলোকের কর্মের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ইহজগতে অবনতির আশঙ্কা আছে, কিন্তু পরলোকে কেবল উন্নতি হইবে, অবনতি নাই। সেখানে রুহানী আমল এবং রুহানী উন্নতির ধারা চির প্রবাহমান থাকিবে। সুতরাং সীমাবদ্ধ কর্ম ও সীমাবদ্ধ প্রতিফলের কোন প্রশ্নই উঠে না।

বিচার কালের প্রভু। مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

শব্দার্থ: مَالِك—مَلِك—مُلْك তিনটি নিকটতর অর্থবোধক শব্দ। مَالِك যাহার কোন বস্তুর উপর ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা আছে, তাহাকে উহার মালেক বলে। مَلَك শব্দের অর্থ ফেরেস্তা। مَلِك শব্দের অর্থ বাদশাহ, যাহার শাসন ক্ষমতা আছে।

يَوْم শব্দের অর্থ কাল। কুরআন মজিদে ইহা এক মুহূর্ত হইতে পঞ্চাশ হাজার বৎসর পর্যন্ত সময়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

اَلدِّين শব্দের মোটামুটি অর্থ পরকাল। دِين শব্দটির আরও অনেক অর্থ আছে, যথা:

(১) প্রতিশোধ, প্রতিকার বা ক্ষতি পূরণ, (২) আনুগত্য, (৩) পাপ ও পুণ্যের বিচার বা হিসাব, (৪) প্রভাব বা প্রতিপত্তি, (৫) প্রভুত্ব বা শাসন (৬) পরিকল্পনা, (৭) প্রার্থনা, (৮) শরীয়ত, (৯) সাধুতা, (১০) অবস্থা বা পরিস্থিতি, (১১) ঐশী ফয়সালা (১২) অভ্যাস বা রীতি বা প্রথা।

এই আয়াতের অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালা বিচার কালের মালিক (প্রভু), পুরস্কার ও শাস্তির সময়ের মালিক, ধর্ম যুগের মালিক, পূণ্যের যুগের মালিক, পাপের যুগের মালিক, হিসাব লইবার সময়ের মালিক, আমাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার মালিক ইত্যাদি।

অবশ্য সাধারণতঃ এই আয়াতের অর্থ কেয়ামতের দিনের মালিক করা হয়। কিন্তু

ইহার অর্থ ব্যপক, যেরূপ উপরে বলা হইয়াছে। যদিও বিচারের কার্য প্রক্রিয়া ইহ জীবনেও প্রতিমুহূর্তে সচল রহিয়াছে, তবুও শেষ, চূড়ান্ত ও পূর্ণ বিচার কেয়ামতের দিনে হইবে। সুতরাং এই আয়াতের এক অর্থ হইবে, কেয়ামতের দিনের মালিক। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের ইহ জীবনের কার্যকালেও প্রতি মুহূর্ত ও প্রতি অবস্থার বিচারের কার্য-প্রক্রিয়ার মালিক। এ দুয়ের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। ইহ জীবনে মানুষেও আমাদের কাজের বিচার করিয়া পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করে, যেমন রাজা, বাদশাহ্, শাসক, গুরুজন, শিক্ষক ইত্যাদি। কিন্তু তাহাদের বিচারে ভুলের অবকাশ আছে। পক্ষান্তরে কেয়ামতের দিনে চূড়ান্ত এবং একক প্রভূত্ব এবং বিচারের কাজ আল্লাহ্তায়ালা নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন। সেদিন পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহার হইবে এবং তাঁহার বিচারে কোন ভুল হইবে না এবং পুরস্কার ও শাস্তির বিধান ত্রুটিহীন হইবে। মানুষের বিচার ও আল্লাহ্তায়ালার বিচারের পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য মালেকে ইয়াওমিদ্দীনের অর্থ করা হইয়াছে আল্লাহ্তায়ালা কেয়ামতের দিনের মালিক, যাহাতে ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয় যে, সেদিন সকলের বিচারের অধিকার রহিত হইয়া যাইবে এবং একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা সেদিন প্রভু হিসাবে বিচারের আসনকে অলঙ্কৃত করিবেন।

বিচারের ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা নিজেকে মালিক বলার উদ্দেশ্য বান্দাকে অভয় দেওয়া যে, তিনি একজন জাগতিক বিচারকের ন্যায় নহেন, যিনি নির্দিষ্ট আইনানুযায়ী রায় প্রদান ও প্রকাশ করিতে বাধ্য। বরং তিনি প্রভু হিসাবে যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন পন্থায় ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করিবার অধিকারী। অত্র আয়াতে প্রভু শব্দের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দ্বিবিধ। একটি হইল মুহূর্তের দুর্বলতায় অনুষ্ঠিত পাপের জন্য অনুতপ্ত মানবকে নৈরাশ্য হইতে বাঁচাইতে এবং তাঁহার মনে আশার সঞ্চার করিতে যে, আল্লাহতায়ালা প্রভু হিসাবে তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবার ক্ষমতা রাখেন। পক্ষান্তরে ইহা একটি সতর্কবাণী যে, কেহ যেন আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমার অযথা সুযোগ লইবার চেষ্টা না করে। কারণ প্রভু হিসাবে যেমন তিনি যথা স্থানে ক্ষমা করিয়া থাকেন, তেমনি তিনি তাঁহার বান্দাকে পাপে লিপ্ত দেখিতে অপছন্দ করেন। সুতরাং খোদাতায়ালা নিজেকে বিচার কালের প্রভু বলিয়া একদিকে মানবকে যেমন তাহার দুর্বলতা বশতঃ সংকল্পবিহীন অপরাধের জন্য অভয় বাণী শুনাইয়াছেন, তেমনি পরিকল্পিত অপরাধের বিরুদ্ধে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা মানুষের মনে আশা ও ভয়ের ভাব সমভাবে সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে সদা হুশীয়ার ও উদ্যমশীল থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও প্রগতির জন্য অপরিহার্য।

খৃষ্টিয় মতবাদ পাপের ফ্রী লাইসেন্স

খৃষ্টিয় ধর্ম নাজাতের ভ্রান্ত শিক্ষার দ্বারা ন্যায়বিচারের অপব্যাখ্যা করিয়া মানুষকে একদিকে

নৈরাশ্যকূপে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং অপর দিকে কাফ্ফারার মতবাদ পেশ করিয়া মানুষকে পাপকার্যে উৎসাহিত করিয়াছে। খৃষ্ট ধর্মের শিক্ষা এই যে, মানব আদিমাতা হাওয়া হইতে উত্তরাধীকারি সূত্রে পাপী হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং একমাত্র যীশুর শূলে আত্মাহুতিদানে বিশ্বাস করিলেই পাপ মোচন হইয়া মুক্তিলাভ হয়, কোন নেক আমলের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। এই শিক্ষার উভয় দিকই মানবকে পবিত্রতার দিকে না নিয়া বরং গুণাহের দিকে আকর্ষণ করে। এই মতবাদ একদিকে মানুষকে জীবনে নিরাশ করিয়া তাহার নেকীর উদ্যম নষ্ট করে এবং তাহাকে গুণাহের দিকে লিপ্ত করে এবং অপর দিকে তাহাকে কাফ্-ফারার উপর নির্ভরশীল করিয়া পাপে প্ররোচিত করে। এই মতবাদ পাপ করিবার ফ্রী লাইসেন্স স্বরূপ।

আমরা উপরে এই আয়াতের এক অর্থ ধর্ম বা শরীয়তের সময়ের মালিক বলিয়াছি। ইহার মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মের এক সূক্ষ্ম মযমুন বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণভাবে মানবজাতির সহিত খোদাতায়ালার ব্যবহার সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে হইয়া থাকে। কিন্তু যে যুগে ধর্ম বা শরীয়তের ভিত্তি স্থাপিত বা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর যুগে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার মালেকীয়তের (প্রভুত্বের) গুণের প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন আল্লাহ্-তায়ালার শুধু বাদশাহাতের গুণের প্রকাশ হয় না, যাহার সম্বন্ধ সাধারণ প্রাকৃতিক বিধানের সহিত সম্পৃক্ত, বরং সেই যুগে আল্লাহ্তায়ালার মালেকীয়তের গুণের বিশেষ প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই সময়ে তিনি বিশেষ পন্থায় কাজ করিয়া থাকেন। যাহারা খোদাতায়ালার গুণাবলী সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে না, তাহারা দেখে প্রাকৃতিক নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। এক সম্বলহীন ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া দুনিয়ার সামনে খোদার আদেশে দাবী পেশ করেন, সকলে তাঁহাকে প্রত্যা-খ্যান করে এবং তাঁহার বিরোধিতা করে। বাহ্যিক পরিবেশও তাঁহার প্রতিকুল দেখা যায়। কিন্তু তবু এই ব্যক্তি জয়যুক্ত হয়েন এবং বিরোধীদল নির্মূল হইয়া যায় এবং প্রতিকূল পরিবেশ অনুকুল হইয়া যায়। অনুরূপ ভাবে আরও বহু ব্যাপারে, যথা দোওয়া এবং মওজেযাতের মাধ্যমে এমন সব ঘটনা ঘটে, যাহা জগত দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া যায়। বস্তুতঃ যখন আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়ায় কোন রুহানী সেলসেলা বা শরীয়ত কায়েম করিতে চাহেন, তখন তিনি তাঁহার বাদশাহীয়তের উর্ধে মালেকীয়তের গুণের বিশেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহার সাধারণ কুদরতের পরিবর্তে প্রিয় বান্দাগণের জন্য নির্দিষ্ট তাঁহার বিশেষ ব্যবহারের প্রকাশ আরম্ভ করিয়া দেন। এইরূপ সময়ে এমন ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়, যাহা অসাধারণ মনে হয়। প্রত্যেক নবীর যুগে আল্লাহ্তায়ালার এই প্রকারের সুন্নত প্রাকাশিত হইয়া আসিতেছে। এই সুরায় ইহা বলা হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর যামানায়ও এইরূপ হইবে। সাধারণ নিয়মের বিপরীত অসাধারণ ঘটনাবলী তাঁহার সহায়ক হইবে।

এতদ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে যে, ইহা শরীয়তের প্রতিষ্ঠার যামানা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সত্য রসুল।

উপরে এই আয়াতের এক অর্থ করা হইয়াছে যে, তিনি পাপ এবং পুণ্যের যুগের মালিক। দুনিয়ায় দুই প্রকার যুগ আসে। এক যুগ, যখন পাপ ও পুণ্য পাশাপাশি বিরাজ করিতে থাকে। আর এক যুগ আসে যখন কেবলই পাপ বিস্তার লাভ করে। সেই সময়ে আল্লাহ্ মালেক রূপে প্রকাশিত হন এবং স্বীয় বাগানের সংস্কারকল্পে নবী প্রেরণ করেন এবং তাঁহার দ্বারা পৃথিবীতে এক পবিত্র জাতি কায়েম করেন। এইরূপ সময়ে আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় বিশেষ নিয়মের দ্বারা তাঁহার মানোনীত জাতিকে সাহায্য করিয়া যাইতে থাকেন। অতঃপর ঐ জাতি কালের প্রবাহে আদর্শচ্যুত হইয়া পুণ্য হইতে নামিয়া পাপের স্রোতে গা ভাসাইতে আরম্ভ করে। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার খাস তকদীরকে ফিরাইয়া লয়েন এবং তাহাদের সহিত সাধারণ বিধানে ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দেন। পরিশেষে ঐ জাতি আবার যখন একেবারে অধঃপতিত হইয়া যায়, তখন আবার তিনি মালেকীয়তের গুণের প্রকাশ করিয়া নবী প্রেরণ করেন। তিনি পাপের মূলোচ্ছেদ করিয়া আবার এক পবিত্র জাতি গঠন করেন। সে সময় পুনরায় আল্লাহ্-তায়ালা আপন মালিকানা কুদরত এবং ক্ষমতার প্রকাশ করিতে থাকেন। কালপ্রবাহে আবার ঐ জাতি অধঃপতিত হয় এবং এই চক্র আবর্তন করিতে থাকে।

এই আয়াতের এক অর্থ আল্লাহ্তায়ালা আনুগত্যের সময়ের মালিক। নবীর কওমের সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালার যে খাস তকদীরের কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা আল্লাহ্-তায়ালা বিশেষ ব্যক্তিগণের জন্যও প্রকাশ করিয়া থাকেন। যখন কোন ব্যক্তি তাহার জীবন আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ আনুগত্যে যাপন করে, তখন তাহার জন্যও আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার খাস কুদরত প্রকাশ করেন। তখন ঐ ব্যক্তি সাধারণ মানুষের ন্যায় থাকে না, সে আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হয়।

এই আয়াতের এক অর্থ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালা আমাদের বিশেষ এবং গুরুত্বপুর্ণ অবস্থার মালিক। ইহা ইঙ্গিত করিতেছে যে, দুনিয়ার প্রত্যেক কাজের দৃষ্টান্ত এক শৃঙ্খলের ন্যায়। কোন ঘটনা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নহে। বরং উহার বহু কড়ি থাকে। যথা কোন অসুখ একদিনের ত্রুটির জন্য হয় না, অথবা স্বাস্থ্য একদিনের আহার বা ব্যায়াম দ্বারা লাভ করা যায় না। মানুষের কাজের দুইটি ফল ফলিয়া থাকে। একটি হইল সাময়িক এবং অপরটি হইল শেষ ও স্থায়ী। যেমন কোন ব্যক্তি চক্ষুর অপব্যবহার করিয়া চক্ষু বেদনায় আক্রান্ত হইল এবং ইহা চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া গেল। আবার চক্ষুর অপব্যবহার করিয়া সে চক্ষু বেদনায় আক্রান্ত হইল। পুনরায় সে চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য

লাভ করিল। এই ভাবে বার বার অসাবধান হইতে থাকিলে পরিণামে তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে। তখন চিকিৎসা কোন কাজে লাগিবে না। এক পরিশ্রমী ছাত্র মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা করে। ইহাতে তাহার শিক্ষক সন্তুষ্ট হয়। দ্বিতীয় দিন আবার সে পড়া তৈরী করে। শিক্ষক আবার সন্তুষ্ট হয়। এইরূপ পড়া তৈরী করার এক ফল প্রতিদিন সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার এক সুপ্রভাব তাহার মন ও মস্তিষ্কে পড়িতে থাকে এবং পুস্তকে পড়া বিদ্যা ক্রমে জ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিবার জন্য তাহার মেধাকে খুলিয়া দেয়। ফলে সে একদিন দুনিয়ায় মর্যাদা ও প্রশংসা লাভ করে। এই পরম ফল এরূপ সূক্ষ্মভাবে সৃষ্টি হইতে থাকে যে, তাহার সঙ্গী ও বন্ধুগণও টের পায় না এবং ইহার কারণও বুঝিতে পারে না।

এই মযমুন আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনেই লাভ হইতে পারে। অবশ্য মানুষ সাধারণ নিয়মের অনুগামী হইয়া সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত ফল, যাহা ক্রিয়াসমূহের শৃঙ্খল পূর্ণ হইলে প্রকাশিত হয়, উহাই সমাদরের যোগ্য। বিশেষ করিয়া যাহা মৃত্যুর সময় ঈমানের আকারে প্রকাশিত হয় এবং যাহার উপর পারলৌকিক জীবনের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই কাম্য।

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আয়াতের এই অর্থই নহে যে, আল্লাহ্তায়ালা কেয়ামতের দিনের মালিক, বরং ইহাও যে, সেদিন বাহ্যিকভাবে তিনি ব্যতিরেকে আর কেহ মালিক থাকিবে না।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَّالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ -

অর্থাৎ "তোমরা কি জান ইয়াওমুদ্দীন কি? ইয়াওমুদ্দীন সেই দিন, যখন অপর কেহ কোন কাজে আসিবে না। সে দিন পূর্ণ ক্ষমতা এবং আদেশ কেবল খোদাতায়ালার হইবে।" (সুরা ইনফেতার)। সুতরাং মালিক শব্দের অর্থ এই যে, এই দুনিয়ায় বাহ্যিকভাবে যে সকল বাদশাহ, বিচারক এবং মালিক দেখা যায়, তাহাদের সেলসেলা পরলোকে শেষ হইয়া যাইবে। সেদিন একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা মালিক হইবেন। ইহ-লোকে তিনি পূণ্যের আংশিক পুরস্কার দেন এবং পাপেরও আংশিক শাস্তি দিয়া থাকেন।

কারণ ইহলোকে সীমিত জীবনে এবং সীমিত পরিবেশে পূর্ণ পুরস্কার এবং পূর্ণ শাস্তি সম্ভবপর নহে। ইহা পরলোকে অনন্ত ও প্রসারিত জীবনেই সম্ভবপর। তদনুযায়ী তিনি এই ব্যবস্থাই রাখিয়াছেন এবং مالك يوم الدين আয়াতে সেই তথ্যই প্রকাশিত হইয়াছে।

যাহারা পরকালে অবিশ্বাসী, তাহাদেরও ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন এই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে। যেহেতু ইহজীবনে পূর্ণ পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা নাই, সেই জন্য মৃত্যুর পর এক পূর্ণ বিচারের দিন থাকা প্রয়োজন এবং বিচারের ফলাফল ভোগেরও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আস্তিক ও নাস্তিক সকল মানুষের বিবেক ইহা চাহে যে, পাপী পূর্ণ শাস্তি ভোগ করুক এবং সাধুগণ যথাযোগ্য পুরস্কার প্রাপ্ত হউক। বিবেকের এই চাহিদা পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার মালেকে ইয়াওমিদ্দীনের সেফতে কেয়ামতের দিনের ব্যবস্থা এবং বেহেস্ত ও দোযখের সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতিরেকে আল্লাহ্তায়ালা মানবকে যেরূপ বিভিন্নমুখী ক্ষমতা, জ্ঞান বুদ্ধি ও বৃত্তিসমূহের বর্ধমান পিপাসা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাদের কোনটিই ইহজীবনে পূর্ণ হইবার নহে, বরং কখনই পূর্ণ হইবার নহে। যাহার অল্প কয়েক দিনের পার্থিব জীবনের জন্য ইহধামে এত বড় বিশ্ব-জোড়া আয়োজন করা হইয়াছে, শত শত অপূর্ণ পিপাসা সহকারে তাহার মৃত্যু তাহার জীবনের লক্ষ্য হইতে পারেনা এবং ইহাতেই তাহার শেষও হইতে পারে না। তাহার সৃষ্টি ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত প্রগতির ছাঁচে সীমাহীন জীবনের আহ্বান রহিয়াছে। সুতরাং যুক্তি, বিবেচনা, বিচার ও প্রকৃতিসম্মত ভাবেই তাহার অনন্ত পরলোকের প্রয়োজন। আল্লাহ্তায়ালার মালেকে ইয়াওমিদ্দীনের সেফত আমাদিগকে ইহার নিশ্চয়তা দান করিয়াছে।

উপরে বর্ণিত ২ হইতে ৪ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালার চারিটি সেফতের উল্লেখ হইয়াছে। যথা (১) رب العالمين রাব্বেল আলামীন। (২) الرحمن আর-রহমান। الرحيم আর-রহীম। (৩) مالك يوم الدين মালেকে ইয়াওমিদ্দীন। এই চারিটি সেফত চারিটি স্তম্ভের ন্যায়, যাহাদের উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার আরশ স্থাপিত। তাঁহার অপরাপর গুণাবলী এই চারিটি বুনিয়াদী সেফতের ভাষ্য স্বরূপ। এই সকল সেফত আমাদিগকে অনন্ত জীবনের পথে হাত ধরিয়া সদা আগাইয়া লইয়া যায়।

আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিবার সন্ধান—
আল্লাহ্তায়ালা এবং বান্দার মধ্যে সোপান

উপরে বর্ণিত চারিটি সেফতে এবং যে তরতীবে উহাদের বিন্যাস করা হইয়াছে, উহাতে আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিবার এক উচ্চ ও সূক্ষ্ম রহস্যের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে।

যখন আমরা এই বিষয় লক্ষ্য করি যে, আল্লাহ্তায়ালার মোকাম উচ্চে এবং বান্দার মোকাম নিম্নে, তখন স্বতঃই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, যখন আল্লাহ্তায়ালা বান্দার দিকে আসেন, তখন তিনি উপর হইতে নিচের দিকে আসেন, কিন্তু যখন বান্দা আল্লাহ্তায়ালার দিকে যাইতে চাহে, তখন তাহাকে নিম্ন হইতে উর্ধ দিকে যাইতে হইবে। এই রহস্যটি বুঝিবার পর, সুরা ফাতেহায় আল্লাহ্তায়ালার যে চারিটি সেফত বর্ণিত হইয়াছে, আমরা উহাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিব। আল্লাহ্তায়ালা বান্দার দিকে আগমন করিতে রুহানী সোপান স্বরূপ (১) رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (২) الرَّحْمٰنِ (৩) الرَّحِيْمِ (৪) مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এই চারিটি সেফতের ধাপে ধাপে নিম্নে অবতরণ করেন। অর্থাৎ যখন তিনি স্বীয় বান্দার উপর প্রকাশিত হইতে চাহেন, তখন তিনি প্রথমে তাঁহার রাব্বেল আলামীনের সেফত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তিনি এমন পরিবেশের সৃষ্টি করেন, যাহার মধ্যে তাঁহার মনোনীত ও প্রিয় বান্দার সুষ্ঠু প্রতিপালনের ব্যবস্থা হয়। অতঃপর তাঁহার রহমানীয়তের সেফত কার্যকরী হয় এবং তিনি বান্দার নৈতিক ও রুহানী উন্নতির জন্য উপযোগী সুযোগ ও উপকরণ সমূহ তাহার হস্তে অর্পণ করেন, যদ্বারা সে রুহানী উন্নতি লাভ করে। বান্দা যখন প্রদত্ত উপকরণ সমূহের সদ্ব্যবহার করে, তখন আল্লাহ্তায়ালার রহীমীয়তের সেফতের প্রকাশ হয় এবং তাহার কাজের উত্তম ফল বাহির হইতে থাকে এবং আল্লাহ্তায়ালা তাহার প্রচেষ্টার জন্য তাহাকে পুরস্কৃত করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর তাহার জন্য আল্লাহতায়ালার মালেকে ইয়াওমিদ্দীন সেফতের প্রকাশ হয়। তাহার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার চূড়ান্ত ও সমষ্টিগত ফল-স্বরূপ তিনি তাহার জন্য নেয়ামত সমূহের এক লম্বা সেলসেলা উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং স্বীয় মালেকীয়তের প্রতিবিম্ব স্বরূপ তাহাকে দুনিয়ায় রুহানী ও জাগতিক আধিপত্য দান করেন। ইহাই বান্দার দিকে আল্লাহ্তায়ালার অবতরণের ধারা।

পক্ষান্তরে বান্দা যখন আল্লাহ্তায়ালার দিকে যাইতে চাহে, তখন যাত্রার ধারা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যায়। খোদাতায়ালা তাঁহার অবতরণের সিড়ির যে শেষ ধাপে নামিয়া আসেন, বান্দা সেই ধাপে প্রথম পা রাখে। সে নিজের মধ্যে মালেকীয়তের সেফতের অনুশীলন আরম্ভ করে। এই পর্যায়ে সে দয়া ও ক্ষমা মিশ্রিত عدل ন্যায়-বিচারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকে। যখন দয়া ও ক্ষমার গুণ তাহার মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠে, তখন সে আল্লাহ্তায়ালার দিকে চলার প্রথম ধাপ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় ধাপে

পা রাখে এবং সে নিজের মধ্যে রহীমীয়তের গুণের প্রকাশ আরম্ভ করে। সে মানুষকে কাজের প্রতিদানে মুক্ত হস্তে পুরস্কৃত করিতে থাকে। ইহাকে احسان বা বদান্যতার পর্যায় বলে। ইহার পরবর্তী ধাপ হইল রহমানীয়তের। এই পর্যায়ে বান্দার দানের প্রবণতা বৃদ্ধিলাভ করে। তাহার দানশীলতা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়ের প্রতি সমভাবে প্রকাশিত হয়। মা যেমন তাহার সন্তানগণের প্রতি স্নেহশীল ব্যবহার করে, তাহার ব্যবহার সকলের প্রতি সেই প্রকার হইয়া থাকে। সে কোন প্রতিদানের আকাঙ্খা রাখে না। স্বভাবজ মমতার ন্যায় প্রেরণা তাহার মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই পর্যায়কে اِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى আত্মীয় সুলভ ব্যবহার নাম দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর বান্দা তাহার যাত্রার শেষ পর্যায়ে পদক্ষেপ করে। অর্থাৎ রবুবীয়তের পর্যায়ে। ইহাই রুহানীয়তের চূড়ান্ত পর্যায়। এই পর্যায়ে মানব আল্লাহ্-তায়ালার رب العلمين এর সেফতের বিকাশক হয়েন। তিনি তখন মানব নির্বিশেষে জগতের সকলের কল্যাণ ও হেদায়েতের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার লক্ষ্য কেবল নিজের এবং নিজের সঙ্গীগণের কল্যাণ ও হেদায়েতই নহে বরং তিনি বিশ্বের কল্যাণ ও হেদায়েত লাভ চাহেন। তাঁহার দৃষ্টি ব্যক্তিকে ছাড়িয়া সমষ্টির উপর গিয়া পড়ে। এ কাজে তিনি খোদা-প্রদত্ত তাঁহার সকল শক্তি নিয়োজিত করেন এবং সমাজ ও জাতির মধ্যে সংশোধন ও আমুল পরিবর্তন সাধন করেন। আলোচ্য তিনটি আয়াতে খোদাতায়ালার অবতরণ ও বান্দার উর্ধগমনের পূর্ণ ব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। খোদাতায়ালা বান্দার দিকে অবতরণ করিতে প্রথমে রবুবীয়তের ধাপে পা রাখেন, অতঃপর রহমানীয়তের ধাপে, তাহার পর রহীমীয়তের ধাপে এবং পরিশেষে মালেকীয়তের ধাপে। বান্দা আল্লাহ্তায়ালার দিকে উর্ধগমনে প্রথমে মালেকীয়তের ধাপে পা রাখে, অতঃপর রহীমীয়তের ধাপে, তাহার পর রহমানীয়তের ধাপে এবং পরিশেষে রবুবীয়তের ধাপে উপনীত হয়। অন্য কথায় সে নিজেকে প্রথমে আল্লাহ্তায়ালার মালেকীয়তের সেফতের রঙে রঙিন করে, অতঃপর রহীমীয়তের রঙে, তাহার পর রহমানীয়তের রঙে এবং পরিশেষে রবুবীয়তের রঙে রঙিন করে। এই ধাপগুলিকে বান্দার জন্য যথাক্রমে রবুবীয়তে, আত্মীয় সুলভ ব্যবহার, এহ্সান ও আদলের পর্যায় বলিয়াও আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এই সকল পর্যায়ে অধিষ্ঠিত পুরুষগণকে আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনে যথাক্রমে সালেহ, শহীদ, সিদ্দিক ও নবী আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য যাচনা করি।

শব্দার্থ: إِيَّاكَ এর অর্থ-একমাত্র তোমারই। نَعْبُدُ এর অর্থ— আমরা এবাদত করি। এবাদত একমাত্র সেই অস্তিত্বের হক, যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং যাঁহার কোন শরীক নাই। এইরূপ অস্তিত্বই একমাত্র এবাদতের যোগ্য। এবাদতের অর্থ, পূর্ণ আত্ম-বিলীনতা সহ অবিচল আনুগত্য ও আদেশ পালন, বা যাহার ফলে উপাসনাকারীর মধ্যে উপাস্যের নকসা অঙ্কিত হইয়া যায়। إِيَّاكَ نَعْبُدُ বাক্যের অর্থ হইল আমরা একমাত্র তোমাকেই এবাদতের জন্য বাছিয়া লইয়াছি। ইসলামে এবাদত শুধু নামায, রোযা ইত্যাদি বিষয়াবলী পালনকে বুঝায় না। বরং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী যে কোন কাজ করা যায়, উহাই এবাদতের অন্তর্গত। বুখারীর এক হাদিসে আছে যে, তুমি যদি এক মুষ্টি আহার্য (আল্লাহ্‌র আদেশকে স্মরণ করিয়া) তোমার স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দাও, তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট ইহার পুরস্কার পাইবে। সুতরাং এই কাজ আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে পালন করার জন্য ইহা এবাদতের অন্তর্গত ও পুরস্কারের যোগ্য।

نَسْتَعِينُ বাক্যের অর্থ, উপরুক্ত ভাবে আমরা সাহায্য যাচনার স্থল হিসাবে একমাত্র তোমাকেই বাছিয়া লইয়াছি।

তফসীর

মযমুনে পুরুষ পরিবর্তনের হিকমত

অত্র সূরার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ হইতে مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ পর্যন্ত মযমুন প্রথম পুরুষ (Third person)-এ বর্ণিত হইয়াছে। সহসা إِيَّاكَ نَعْبُدُ বাক্যে আসিয়া মযমুন উত্তম পুরুষ (First person)-এ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বাহ্যতঃ এই পরিবর্তনে খটকা লাগে। বস্তুতঃ এই পরিবর্তনে এক সূক্ষ্ম তত্ব নিহিত আছে। বান্দা যখন আল্লাহ্‌তায়ালাকে কল্পনা করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার সম্মুখে সব অন্ধকার। সে কিছু দেখে না। অতঃপর রব্বেল

আলামীন হইতে মালেকে ইয়াওমিদ্দীন পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালার সেফত সমূহের মর্ম হৃদয়ে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তাহার মর্ম-চক্ষে তাঁহার অস্তিত্ব দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এবাদত আরম্ভে তিনি গায়েব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিচয়-জ্ঞাপক গুণাবলী অন্তর-চক্ষে ভাসিয়া উঠার ফলে এখন তিনি অন্তরদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকভাবে হাজির হইয়াছেন। আল্লাহতায়ালা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। বান্দা তাঁহাকে বাহ্য চক্ষে দেখিতে পারে না। তাঁহার সেফাতের মাধ্যমে তাঁহাকে চেনা যায় এবং তাঁহার যিক্রের দ্বারা তিনি নিকটবর্তী হয়েন। তখন বান্দার অন্তর-চক্ষু মওলাকে দেখিয়া লয়। আলোচ্য আয়াত ও উহাদের মযমুন ভঙ্গির মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার সহিত নিকট সম্বন্ধ স্থাপনের গূঢ় তত্ব বর্ণিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, রাব্বেল আলামীন, রহমান, রহীম এবং মালেকে ইয়াওমিদ্দীন সেফতগুলির প্রতি বান্দা যদি গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার অন্তর-চক্ষু খুলিয়া যাইবে এবং তাহার হৃদয়ে গভীর ঐশী প্রেমের সৃষ্টি হইবে। ফলে রুহানীভাবে সে আল্লাহ্তায়ালার দীদার (সাক্ষাৎ) লাভ করিবে এবং তাঁহার প্রেমে সে এমন অভিভূত হইয়া যাইবে যে, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে, "হে আমার রব, আমি তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট হইতে সাহায্য যাচনা করি।" পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্তায়ালার সেফতগুলির প্রতি মনোনিবেশ করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে মানুষ আল্লাহ্তায়ালার সাক্ষ্যাৎ লাভ করিবে এবং তাঁহার সুরত তাহার সম্মুখে আধ্যাত্মিকভাবে প্রতিভাত হইবে। আবু হোরেরা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, "আমি সুরা ফাতেহাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে ভাগ করিয়াছি। ইহার অর্ধেক আমার জন্য এবং বাকি অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা আমার নিকট যাহা চাহিবে, আমি তাহাকে তাহা দিব। এবং যখন বান্দা বলে الحمد لله رب العالمين আলহামদো লিল্লাহে রব্বেল আলামীন, তখন অল্লাহ্তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করিয়াছে। যখন সে বলে الرحمن الرحيم আর-রহমানের-রহীম তখন আল্লাহ্তায়ালা বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে। যখন বান্দা বলে مالك يوم الدين মালেকে ইয়াওমিদ্দীন তখন আল্লাহ্তায়ালা বলেন, বান্দা আমার মহিমাগান করিয়াছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে إياك نعبد وإياك نستعين ইয়্যাকানাবোদো ওয়া ইয়্যাকা-নাস্তায়ীন, তখন আল্লাহ্তায়ালা বলেন, বান্দা তাহার সবকিছু আমার নিকট সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করিয়া দিয়াছে। এই আয়াত আমার ও আমার বান্দার মধ্যে নিবদ্ধ। আমার বান্দা যাহা কিছু চাহিয়াছে, আমি তাহাকে দিব। অতঃপর বান্দা যখন

اهدنا الصراط المستقيم হইতে সুরার শেষ আয়াত পর্যন্ত নিবেদন করে, তখন আল্লাহ্তায়ালা বলেন, এই দোওয়া আমার বান্দার জন্য, সুতরাং এই সব কিছু যাহা সে চাহে, সে পাইবে।"

আলোচ্য আয়াতে نعبد শব্দের পর نستعين শব্দ রাখা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁহার পরিচয় লাভের পর, বান্দার মনে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া আসে তাহা এই যে, আমি তোমারই এবাদত করি। কিন্তু এবাদতের সঙ্কল্প করার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখে যে, এ বিষয়ে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যের প্রয়োজন। যেহেতু সে ভাবিয়া পায় না যে কিভাবে তাঁহার এবাদত করিবে, এই জন্যই সাহায্য কামনা করার পূর্বে তাঁহার এবাদত করার কথা আসিয়াছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্-তায়ালার এবাদত করে না, তাহার জন্য সাহায্য যাচনা করার প্রশ্ন উঠে না। এই জন্য সাহায্য যাচনা করার কথা আগে না আসিয়া পরে আসিয়াছে। যে এবাদত করিতে চাহে সে-ই সাহায্য চাহিবে। এই দুই শব্দের এই প্রকার বিন্যাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সংকল্প বান্দার পক্ষ হইতে হয়, এবং তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যে হয়। যদি সাহায্য চাওয়ার কথা প্রথমে এবং এবাদত করার কথা পরে আসিত, তাহা হইলে অর্থ দাঁড়াইত যে তোমার এবাদতের সংকল্পের জন্য তোমার সাহায্য চাই। এমতাবস্থায় এবাদতের ইচ্ছাও যদি আল্লাহ্তায়ালার দ্বারা সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে মানুষের এবাদত বাধ্যতা-মূলক হইয়া পড়িত। অথচ আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ - ধর্মে কোন জবরদস্তি নাই। ধর্মগ্রহণ ও উহার পালনকে স্বেচ্ছামূলক করা হইয়াছে। এই জন্যই ধর্মাধর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এবাদতের এরাদা বাধ্যতামূলক হইলে পুরস্কারের কোন প্রশ্ন উঠিত না। আলোচ্য আয়াত সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, এবাদতের সংকল্প বাধ্যতামূলক নহে, বরং উহা স্বতঃস্ফূর্ত। ফলে বান্দা এ বিষয়ে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য-ভিখারী হয়। এই জন্য সে বলিয়া উঠে "আমি তোমারই সাহায্য চাহি"। যতক্ষণ আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে তাহার এবাদতের পদ্ধতি বলিয়া না দেন এবং একাজে তাহার সহায়ক না হন ততক্ষণ আল্লাহ্তায়ালার এবাদত করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কোন মানুষের তৈয়ারী পদ্ধতি বা আইন তাহাকে আল্লাহ্তায়ালার আব্দ বা সত্যিকার উপাসক বানাইতে পারে না। তাঁহাকে লাভ করার পথ তিনিই বান্দাকে দেখাইতে পারেন এবং একমাত্র তিনিই বান্দাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারেন। একাজ অন্যের দ্বারা সম্ভব নহে। এই জন্য একমাত্র তোমারই সাহায্য চাই দোওয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

'এবাদত' একান্ত বিনয়ের সহিত পূর্ণ আত্ম-নিবেদনের নাম। ইহার উদ্দেশ্য—বান্দা যেন এতদ্বারা নিজের মধ্যে আল্লাহ্তয়ালার গুণাবলী সৃষ্টি করিয়া লয়। এবাদতের বাহ্যিক আচারাবলী কেবল আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। নচেৎ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে এবাদত, অন্তরের অবস্থা এবং উহার দ্বারা প্রকাশিত, মানুষের আমলের নাম। বিশেষ বিশেষ সময়ে কেবলামুখী হইয়া হাত ধরিয়া খাড়া হওয়া এবং রুকু সেজদা করা আসল এবাদত নহে। যেহেতু দেহের বাহ্যিক অবস্থার প্রভাব হৃদয়ে গিয়া পড়ে এবং মনো-সংযোগ হয়, সেই জন্য নামাযের জন্য কিছু বাহ্যিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু উহা পাত্রাধারের ন্যায়, যাহার মধ্যে মারফতের দুগ্ধ ঢালা হয় অথবা খোসার ন্যায়, যাহার মধ্যে এবাদতের শাঁষ সংরক্ষিত হয়।

আলোচ্য আয়াতের মধ্যে نَعْبُدُ এবং نَسْتَعِيْنُ শব্দদ্বয়ের বহুবচনে ব্যবহার আমাদের দৃষ্টি দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

(১) মানুষ এই দুনিয়ায় একা নহে, বরং সে চারিদিকে পরিবেষ্টিত সমাজের মধ্যে বাস করে এবং সে সেই আবেষ্টনীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং সে কেবল নিজেই আল্লাহ্তায়ালার পথে চলিতে চাহিবে না, বরং সকলকে সঙ্গে লইয়া চলিবে।

(২) যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের পরিবেশ সংশোধিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিজের সংশোধন পারিপার্শ্বিক দুষিত আবহাওয়া হইতে নিরাপদ ও নিশ্চিত হইতে পারে না, যেমন চারিদিকে অগ্নি পরিবেষ্টিত গৃহ বেশীক্ষণ নিরাপদ থাকিতে পারে না।

অত্র আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে "আমরা এবাদত করি" এবং "আমরা সাহায্য যাচনা করি" এবং "আমাদিগকে সরল পথে চালাও" বাক্যগুলি ইঙ্গিত করিতেছে যে, ইসলাম কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নহে, বরং ইহা সমগ্র মানবজাতির ধর্ম। ইহা সমষ্টিগতভাবে সকলের জন্য উন্নতি চাহে। এই সকল বাক্যের মধ্যে এই আদেশও রহিয়াছে যে, প্রত্যেক মুসলমানকে অপর মুসলমানগণের জন্য তত্বাবধায়ক নির্ধারিত করা হইয়াছে। একজন মুসলমানের কাজ শুধু ইহাই নহে যে, সে একা আল্লাহ্তায়ালার এবাদত করিবে বরং সে অন্যদেরকেও এবাদতের দিকে আহ্বান করিবে এবং সে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্রাম করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যেরা তাহার সহিত এবাদতে শামিল না হয়। সে কেবলমাত্র একাই আল্লাহ্তায়ালার উপর তওক্কল বা ভরসা করিবে না বরং অন্যদেরকেও সে এই শিক্ষা দিবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিশ্রাম লইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যেরাও আল্লাহ্তায়ালার উপর তওক্কলে তাহার সঙ্গে শামিল না হয়। সে কেবল নিজেই হেদায়তের প্রার্থনাকারী হইবে না, বরং অন্যদেরকেও সে হেদায়েত প্রার্থনা করার শিক্ষা দিবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হইবে না, যতক্ষণ

পর্যন্ত অন্যদের অন্তরেও হেদায়েত লাভের আকাঙ্খা প্রজ্জলিত হইয়া তাহারা তাহার সহিত শামিল না হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার প্রত্যেক দোওয়ায় "আমি" শব্দের পরিবর্তে "আমরা" শব্দের ব্যবহার সত্য হয়।

মুসলমান জাতির উন্নতির একমাত্র পথ

মুসলমানদের এই তবলীগি (প্রচারমূলক) ও তরবীয়তি (প্রশিক্ষণমূলক) প্রেরণা ইসলামকে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে দূর দূরান্তরে বিস্তারিত করিয়াছিল। মুসলমানগণ আজও যদি উন্নতি করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদিগের অন্তরে সেই প্রেরণাকে প্রদীপিত করিতে হইবে। ইহাই তাহাদিগের উন্নতির একমাত্র পথ। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমানগণ نَعْبُدُ আমরা তোমরই এবাদত করি, نَسْتَعِيْنُ আমরা তোমারই নিকট সাহায্য যাচনা করি এবং اِهْدِنَا আমাদিগকে হেদায়েত কর বাক্যত্রয়ে সত্যনিষ্ঠ হইয়া আল্লাহ্তায়ালার নিকট নিবেদন করে ও তদনুযায়ী আমল করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগের ধর্মক্ষেত্রে বা দুনিয়ার ক্ষেত্রে কোথাও সফলতা আসিবে না। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্তায়ালা মুসলমান জাতির উন্নতি ও প্রাধান্য লাভকে তাহাদের ঈমানের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি কুরআন করীমে বলিয়াছেন, وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

"এবং নিশ্চয় তোমারা প্রধান হইবে, যদি তোমরা মোমেন হও।" (সুরা মোমেন, ১৪শ রুকু)। গত ১৪০০ বৎসরের ইসলামের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহারা যখন যে পরিমাণ খোদার নৈকট্যলাভ করিয়াছে, তাহারা তখন সেই পরিমাণ বিস্ময়কর পার্থিব উন্নতিও লাভ করিয়াছে এবং তাহারা যখন যে পরিমাণ খোদা হইতে দূরে সরিয়াছে, তখন সেই হারে তাহাদের অবনতি ও বিপদ ঘটিয়াছে। আবার যখন যখন তাহারা সংশোধন-মুখী হইয়াছে, তখন তখন তাহারা উন্নতিশীল হইয়াছে। মুসলমান জাতি আল্লাহ্তায়ালার এবাদত, সাহায্য ও হেদায়েতকে বাদ দিয়া কোন ক্ষেত্রে সফল হইতে পারিবে না। এই তিনটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া আবার তাহারা জগতে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে ও করিবে। ইহাই ঐশী বিধান।

প্রকৃতপক্ষে এবাদত, সাহায্য ও হেদায়েত প্রার্থনা, সমিষ্টিগতভাবেই ফলপ্রসূ হইতে পারে। কেহ একাও সাময়িকভাবে এক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এবাদত কায়েম করিতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ সন্তান সন্ততিকে এবং প্রতিবেশীগণকে নিজের সঙ্গী করিয়া লয়, সে এবাদতের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে এবং ইহার স্থায়িত্বকালকে দীর্ঘ করে। ইহার মধ্যে কি কোন সন্দেহ আছে যে, প্রকৃত বান্দা সে-ই, যে স্বীয় প্রভুর সম্পদরাজিকে দুশমনের হস্তগত হওয়া দেখিতে চাহে না। যে ব্যক্তি নিজের প্রভুর বাগানকে লুণ্ঠন এবং ধ্বংস হইতে রক্ষা করার কোন চেষ্টা করে না, যে সত্যিকার বান্দা হইতে পারে না।

কর্মে মানব স্বাধীন, অধীন নহে

কর্মে মানব স্বাধীন অথবা নিয়তির অধীন এ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। ايا ك نعبد و ايا ك نستعين আয়াত ঐ সকল ধারণার খণ্ডন করিয়াছে। মানুষের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে দ্বিবিধ ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। একটি হইল এই যে, মানুষ যত কিছু আমল করে, সে নিয়তির অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে করে। এই ধারণা ধর্ম-কর্মশীল লোকের মধ্যেও আছে এবং দার্শনিকগণের মধ্যেও আছে। মনস্তত্ত্ববিদগণের মধ্যেও একদল এই ধারণা পোষণ করে। এই দলের প্রধান হইল অষ্ট্রীয়ান প্রফেসার ফ্রয়েড। যে সকল ব্যক্তি ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য এই ধারণা পোষণ করে, তাহারা আল্লাহ্তায়ালাকে এক ইঞ্জিনিয়ার সদৃশ কল্পনা করে, যে গাঁথুনির কাজে ইচ্ছা অনুযায়ী একটা ইটকে পায়খানায় এবং আর একটাকে বালাখানায় লাগায়। তাহারা মনে করে যে, আল্লাহ্তায়ালা সর্বাধিপতি হওয়ায়, যাহাকে ইচ্ছা তিনি সৎ করিতে পারেন এবং যাহাকে ইচ্ছা অসৎ করিতে পারেন। তদনুযায়ী তিনি কাহাকেও সাধু এবং কাহাকেও অসাধু করিয়াছেন। খ্রীষ্টানগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাপ অর্জনের বিশ্বাস পোষণ করিয়া অখণ্ডনীয় নিয়তির মতবাদকে প্রসার করিয়াছে। কারণ মানুষ যেহেতু কাফ্ফারা ছাড়া মৌরুসী পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, অতএব প্রায়শ্চিত্যে বিশ্বাস না আনিলে তাহারা পাপী হইতে বাধ্য। পুনর্জন্মবাদেরও উদ্ভব হইয়াছে অখণ্ডনীয় বিধিলিপির বিশ্বাস হইতে। কারণ পুনর্জন্মবাদ অনুযায়ী বর্তমান জীবন পূর্ববর্তী জীবনের কৃত-কর্মের ফল স্বরূপ হওয়ায়, মানুষ বিধিলিপি অনুযায়ী তাহার জন্য নির্ধারিত কাজ করিয়া যাইতে বাধ্য। কর্মে তাহার স্বাধীনতা নাই। এই স্বাধীনতা হইতে সে বঞ্চিত। দার্শনিকগণের আকিদার ভিত্তি কেবল চিন্তা-ভাবনায় এবং পর্যবেক্ষণের উপর স্থাপিত। ফ্রয়েড ইহাকে একটি প্রজ্ঞাভিত্তিক মতবাদে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহার মতে যেহেতু মানুষের শিক্ষার কাল তাহার ইচ্ছার কালের পূর্বে অর্থাৎ বাল্যকালে আরম্ভ হয়, এবং কাজের সংকল্প করার কাল যৌবনে আসে, সেই জন্য ইহা বলা যায় না যে, সে কর্মে স্বাধীন। বরং যাহাকে আমরা সংকল্প বলি, উহা প্রকৃত পক্ষে বাল্যকালে

সে যাহা শিখিয়াছে, উহারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাহার মধ্যে সৃষ্টি হয়। মানুষ নিজের কাজকে স্বেচ্ছাধীন এবং চিন্তাধারাকে স্বাধীন মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সব তাহার বাল্যের শিক্ষার সংস্কার বা ফলশ্রুতি মাত্র। যেহেতু ঐ শিক্ষা তাহার স্বভাবে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য সে স্বীয় কর্মকে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবাধীন মনে না করিয়া স্বেচ্ছাধীন মনে করে।

ডাক্তার ফ্রয়েডের চিন্তাধারা নূতন নহে। ইসলামেও ইহার সনদ রহিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক শিশু ইসলামী স্বভাবে জন্ম গ্রহণ করে। পরে তাহার পিতামাতা তাহাকে ইহুদী বা খ্রীষ্টান বানায়। অর্থাৎ বড় হইবার আগেই শিক্ষার প্রভাবে সে ভ্রান্ত ধারণাসমূহ আহরণ করে এবং না বুঝিয়া শুনিয়া পিতামাতার পথে যাত্রা আরম্ভ করে। এই জন্যই হযরত রসুল করীম (সাঃ) আদেশ দিয়াছেন যে, শিশু জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার কর্ণে আযান দাও। এতদ্বারা তিনি বাল্যের প্রভাবের পরিধি ও গুরুত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।

مالك يوم الدين বাক্যে মানুষ কর্মে বাধ্য এই ভ্রান্ত ধারণাকে নাকচ করা হইয়াছে। কারণ কর্ম বাধ্যতামূলক হইলে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা অর্থহীন হয়। اياك نعبد বাক্যে ইহা স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। যদিও মানুষের ইচ্ছা সীমাবদ্ধ, তথাপি ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সে হেদায়েতকে প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে নিজের জন্য গ্রহণ করিয়া নূতন পথ বাছিয়া লইবার ক্ষমতা রাখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মানুষ মন্দ প্রভাবের অধীন হইয়াও যদি আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর সম্বন্ধে গভীরভাবে মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে তাহার অন্তর হইতে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে اياك نعبد বাক্য নিঃসৃত হইতে পারে এবং আসলে তাহা ঘটিয়াও থাকে। এই কথার বাস্তবতা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। ডাক্তার ফ্রয়েড এবং তাহার অনুগামীগণ এ কথার কি উত্তর দিবে যে, অবস্থার পরিবর্তনের সহিত চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হয়। দুনিয়া কখনও এক অবস্থায় থাকে না। বাল্যকালের প্রভাব যদি অলঙ্ঘনীয় হইত এবং উহা হইতে মানুষ যদি মুক্ত হইতে না পারিত, তাহা হইলে আদম (আঃ)-এর যুগ হইতে আজ পর্যন্ত সকল মানব গড্ডালিকা প্রবাহে একই পথের অর্থাৎ পাপ-পথের পথিক হইত। কিন্তু নবীগণের আগমনে দুনিয়ায় বার বার পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। সুতরাং ঘটনাবলী প্রমাণ করিতেছে যে পরিবর্তন সম্ভব ও স্বাভাবিক এবং বাল্যকালের পরিবেশ উদ্ভূত মানুষের চিন্তাধারা পরবর্তীকালে অন্য ধারায় পরিচালিত হইতে পারে। পবিত্র কুরআন ইহার অকট্য প্রমাণ দিয়াছে। ইহার শিক্ষা

সারা আরবকে পাপের গভীরতম কূপ হইতে ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম শিখরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। পাপীগণ নবীর মারফৎ আল্লাহ্তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়া পুণ্যের প্রতীক হইয়া ইহা দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্তায়ালা মানবের স্বত্বাকে ইসলামী ফিতরত অর্থাৎ নির্মল স্বভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরিবেশে পড়িয়া সাময়িকভাবে পথভ্রান্ত ও পাপাচারী হইলেও সে সুপথেরই যাত্রী।

মানুষ বিধিলিপি অনুযায়ী চিন্তা ও কর্মে বাধ্য এই মতবাদের বিপরীত আর এক মতবাদ আছে। উহা এই যে, মানুষ তাহার চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং আল্লাহ্তায়ালা তাহার কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। ইসলাম এই মতবাদেরও খণ্ডন করিয়াছে। ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, তোমরা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবকে উপেক্ষা করিতে পার না। সুতরাং ইহা একান্ত প্রয়োজন যে, এক উর্ধতন শক্তিধর, যিনি সকল প্রভাবের উপর ক্ষমতাবান, তিনি মানুষের তত্বাবধান করেন এবং যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিপদ-সীমা অতিক্রম করে, তখন মানব জাতিকে সাহায্য করিয়া তদবস্থা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ দোওয়া শিখাইয়া এই বিষয়ের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, তোমাদের খোদা অসহায় দৃষ্টিতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিতেছেন না, বরং তিনি তোমাদের অসহায়তা অবলোকন করিতেছেন। অতএব তোমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদিগকে দান করিবেন। তাঁহার রহমতের দ্বারে আঘাত হান, উহা খুলিয়া যাইবে।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ আমাদিগকে সরল, সঠিক, সহজ পথে পরিচালিত কর।

শব্দার্থ: اِهْدِنَا আমাদিগকে পরিচালিত কর। ইহা هُدًى শব্দ হইতে আসিয়াছে। ইহার এক অর্থ, সঠিক পথ দেখানো এবং সঙ্গে থাকিয়া লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছানো। কুরআন করীমের শিক্ষা অনুযায়ী কোন এক মর্যাদায় পৌছানোর নাম হেদায়েত নহে, বরং একের পর এক অনন্ত মর্যাদার দিকে লইয়া যাওয়াকে হেদায়েত বুঝায়। আর এক অর্থ হইল, কাজের শক্তি ও উপযুক্ত পরিবেশ দিয়া কাজে লাগানো। ইহার আর এক অর্থ, কামিয়াবী ও বিজয় লাভ করা। صِرَاط (সেরাত) শব্দের অর্থ, পরিষ্কার ও সমতল পথ। مُسْتَقِيْم (মুস্তাকিম) শব্দের অর্থ—সরল, সঠিক, সহজ ও ছোট।

তফসীর

হেদায়েত

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আয়াতে এরূপ উচ্চাঙ্গের এবং পূর্ণ দোওয়া শিখানো হইয়াছে, যাহার নযীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। পথ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। (১) সমতল, সরল ছোট ও সহজ (২) বন্ধুর, বক্র এবং বিপদ-সংকুল। আলোচ্য আয়াতে আমাদিগকে (১) দফায় লিখিত পথ চাহিতে শিখানো হইয়াছে। এই দোওয়া কোন বিশেষ একটি বিষয়ের জন্য নহে, বরং ইহা সর্ব প্রকার ছোট ও বড় প্রয়োজনের জন্য। এই দোওয়ার সাহায্যে ধর্মীয় ও পার্থিব সকল কাজেই ফায়দা লাভ করা যায়। ধর্মীয় ও পার্থিব যে কোন কার্য সম্পাদনের জন্যই কোন না কোন পথ নির্দিষ্ট থাকে এবং কেবলমাত্র নির্ধারিত পথ অবলম্বন করিলেই সফলতা অর্জন করা যাইবে এবং ইহার বিপরীতে বিফল হইতে হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি কাজের সম্পাদনার জন্য বিভিন্ন পথ দেখা যায়। ঐ পথগুলির মধ্যে কতক বৈধ এবং কতক অবৈধ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোনটি শীঘ্র লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং কোনটি বিলম্বে। আলোচ্য আয়াতের মধ্যে আমাদিগকে শিখানো হইয়াছে যে, আমরা যেন আল্লাহ্তায়ালার নিকট যাচনা করি যে, তিনি আমাদিগকে এমন পথে চালিত করেন, যাহা সৎ, সরল ও সহজ এবং আমরা যেন ঐ পথে চলিয়া শীঘ্র কামিয়াবী লাভ করি। এই দোওয়া কত পূর্ণাঙ্গীন এবং ব্যাপক! জীবনের কোন্ কাম্য আছে যাহা অর্জনের জন্য আমরা এই দোওয়ার ব্যবহার করিতে পারি না এবং যাহা আমরা এই দোওয়ার সাহায্যে লাভ করিতে পারি না! যে ব্যক্তি এই দোওয়া করিতে অভ্যস্ত সে নিজের পরিশ্রমকে ফলপ্রসু করিতে কতই না প্রচেষ্টারত! কারণ যে ব্যক্তিকে ইহা স্মরণ করানো হয় যে, প্রত্যেক কাজ হাসিল করার জন্য ভাল-মন্দ দুইটি পন্থা আছে এবং তাহার কর্তব্য সদা ভাল পন্থা তালাশ ও অবলম্বন করার চেষ্টা করা এবং ভাল পন্থার মধ্যে সেইটি অবলম্বন করা, যাহা ত্রুটিহীন, ছোট এবং দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছায়। স্বাভাবিক ভাবে তাহার বুদ্ধি যে এই শিক্ষাকেই আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিবে এবং সে তদনুযায়ী কাজ করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। যে ব্যক্তি সেরাতে-মুস্তাকীম লাভ করিবার জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোওয়া করিবে, তাহার মস্তিষ্ক এই দোওয়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে এবং সকল কাজে তাহার প্রচেষ্টা সঠিক পথ লাভে অব্যাহত থাকিবে। যে ব্যক্তি এই নীতি সদা দৃষ্টির সম্মুখে রাখিবে যে (১) আমার সব কাজ বৈধ পন্থায় হওয়া চাই, (২) আমি উন্নতির কোন এক স্তরে গিয়া থামিব না বরং অসীম উন্নতির আকাঙ্খা

আমার হৃদয়ে সদা জাগরুক থাকিবে এবং (৩) আমার সময় যেন নষ্ট না হয় বরং এমন পদ্ধতিতে আমি কাজ করিব, যাহাতে অল্প সময়ে সকল কাজকে সমাধা করিতে পারি, তাহার উচ্চ লক্ষ্য, শুদ্ধ আমল এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি স্পর্শ করিতে পারিবে না।

নিষ্ঠার সহিত মুসলমানগণের এই দোওয়ায় রত থাকা এবং ইহার অর্থকে সদা স্মৃতিপটে জাগরুক রাখা উচিত। ইহাতে দোওয়ার ফলে যে উপকার হইবার তাহা তো হইবেই, পক্ষান্তরে মুসলমানগণের মন ও মস্তিষ্কে ইহার স্বাভাবিক প্রভাবের যে ছাপ পড়িবে, উহার গুরুত্বও কম হইবে না। ইহার ফলে মুসলমানগণ নিরাশা হইতে আশার, অন্ধকার হইতে আলোকের, নিষ্ক্রিয়তা হইতে সক্রিয়তার, অধঃপতন হইতে উন্নতির এবং পরাজয় হইতে বিজয়ের পথে গতিশীল হইবে।

হেদায়েত চিরন্তন

কোন কোন সমালোচক বলিয়া থাকে যে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ দোওয়া মুসলমানগণকে নামাযে পড়িবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদের রসুল (সাঃ)-ও প্রত্যহ এই দোওয়া করিতেন। তবে কি তিনি সেরাতে মুস্তাকিম লাভ করেন নাই? নতুবা কেন তিনি ইহা বার বার পড়িতেন? ইহা এক হাস্যকর প্রশ্ন। আশ্চর্যের কথা যে, লেখাপড়া জানা শিক্ষিত খ্রীষ্টান এবং হিন্দু পণ্ডিতগণের মুখ হইতেও এইরূপ নির্বোধের ন্যায় প্রশ্ন বাহির হয়। তাহারা এই প্রশ্ন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে, মুসলমানগণের নিকট ইহার কোন উত্তর নাই। প্রথম কথা এই যে, উপরে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, হেদায়েত শব্দের অর্থ শুধু পথের কথা বলিয়া দেওয়া নহে, বরং পথ বলার পর, পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিয়া সঙ্গে লইয়া লক্ষ্য পানে যাওয়াকে বুঝায়। সুতরাং বিভিন্ন প্রার্থনাকারীর জন্য এই দোওয়ার মর্ম বিভিন্ন হইবে। যে ব্যক্তি এখনও হেদায়েতের মর্ম বুঝে নাই, তাহার জন্য ইহার অর্থ হইবে, 'হেদায়েত কি তাহা আমাকে জানাও এবং ইহা কোন্ ধর্ম বা তরীকায় আছে তাহা জানাও'। যে ব্যক্তি হেদায়েতের সন্ধান পাইয়াছে, কিন্তু মানসিক দুর্বলতা বা পারিপার্শ্বিক বিরূপ অবস্থার জন্য এখনও সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে নাই অথবা পূর্ণ পথ-প্রদর্শক দূরে অবস্থিত এবং তাঁহার নিকটে পৌঁছিতে পারিতেছেনা অথবা তাহার এলাকায় নেক লোকের সঙ্গ পাওয়া যাইতেছে না, তাহার জন্য এই দোওয়ার অর্থ হইবে, 'আমাকে হেদায়েত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দাও অর্থাৎ যুক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়া আমি সত্যকে বুঝিয়াছি, কিন্তু কার্যতঃ উহাকে গ্রহণ করার পথে যে সকল

প্রতিবন্ধক আছে, উহা দূর করিয়া দাও।' আবার যে ব্যক্তি সত্য গ্রহণে সক্ষম হইয়াছে, তাহার জন্য এই দোওয়ার স্বরূপ হইবে, 'হে খোদা! তোমার হেদায়েত ব্যাপক এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিধি অসীম। তুমি আপন ফযলে আমাকে হেদায়েতের পথে আগে আগে থাকিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চল। আমার কদম কোথাও যেন না থামে এবং সত্যের গোপন তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে আমি যেন ক্রমঃবর্ধিত হারে জ্ঞান লাভ করিয়া যাইতে থাকি এবং বর্ধিত জ্ঞানের সমানুপাতে আমল করিয়া যাইতে পারি।' এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সম্মুখে রাখিয়া বিচার করিলে, কে বলিতে পারে যে, এমন কে আছে, যাহার জীবনে এমন কোন সময় আসিতে পারে, যখন তাহার এই দোওয়ার প্রয়োজন হইবে না? মুসলমানগণের রসুল (সাঃ) নিশ্চয় মানব কুলে সর্বাপেক্ষা কামেল ছিলেন, কিন্তু ইসলামের খোদা অসীম শক্তির অধিপতি। যে কেহ যত উন্নতিই অর্জন করুন না কেন, তাঁহার জন্য অসীম উন্নতির ক্ষেত্র অবশিষ্ট রহিয়াই যাইবে এবং তাঁহার জন্য اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া করার প্রয়োজন সীমাহীন ধারায় বাকি থাকিয়া যাইবে।

ধর্মের ক্ষেত্র ছাড়া দুনিয়ার ক্ষেত্রেও মানুষের জ্ঞান দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কোন জ্ঞানের শাখা নাই, যাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, এই শাখায় অধিকতর উন্নতির অবকাশ নাই। সুতরাং দুনিয়ার কজেও মানুষের জন্য اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া সতত চাহিবার প্রয়োজন রহিয়াছে, যাহাতে এই দোওয়ার সাহায্যে সে ক্রমঃ-উন্নতি করিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে এই দোওয়ায় জ্ঞানের অনুশীলন সম্বন্ধে যে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্বের অকাট্য প্রমাণ দিতেছে। কুরআন করীম পূর্ববর্তী ধর্ম সমূহের উপস্থিতিতে আসিয়াছে এবং সে গুলিকে বাতিল করিয়া এক নূতন এবং পূর্ণ ধর্ম প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়াছে। কিন্তু অপরাপর ধর্মের ন্যায় ইসলাম এ কথা বলে না যে, ইহার আগমনে জ্ঞান শেষ হইয়া গিয়াছে বরং ইহা এই কথা বলে যে, ইহার দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে। এতদুদ্দেশ্যে কুরআন করীম মুসলমানগণকে আলোচ্য দোওয়া শিখাইয়াছে এবং ইহা তাহাদিগকে দৈনিক নামাযে কমপক্ষে ত্রিশ বার পড়াইয়া, জ্ঞানের চির উন্নতি সাধনের জন্য তাহাদের মনকে সদা সজাগ, দৃষ্টিভঙ্গিকে সদা প্রসারিত এবং প্রচেষ্টাকে সদা সচল রাখার নির্দেশ দিয়াছে।

অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে যে, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে কুরআন করীম শেষ হেদায়েত-গ্রন্থ নহে। কারণ জ্ঞানের ক্রমঃ-উন্নতি স্বীকার করিলে ইহা

মানিতে হইবে যে, একদিন কুরআন করীমও বাতিল হইয়া যাইবে এবং অন্য কোন উন্নততর গ্রন্থ ইহার স্থান দখল করিবে। ইহার উত্তর এই যে —

(১) কুরআন মজিদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থের প্রয়োজন হইলে, উহা আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতেই নাযেল হইবে। এইরূপ গ্রন্থের দ্বারা কুরআন মজিদ বাতিল হইলে, আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু গত ১৪০০ বৎসরের মধ্যে অপর কোন গ্রন্থ খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে আসিল না এবং উহার প্রয়োজনও হইল না। যুগ-ইমাম ও মোজাদ্দিদগণ কুরআন করীমের শিক্ষার দ্বারাই যুগে যুগে আমাদের সমস্যার সমাধান করিয়া আসিতেছেন। বাকি থাকিল মানুষের দ্বারা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ রচনার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, দার্শনিক এবং বিকৃত ধর্মের অনুসারীগণ এ যাবৎ বহু চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠতর বিধান রচনা করা দূরের কথা, এমন কি তাহারা ইহার মোকাবিলায় কোন শিক্ষা বা কোন পুস্তকও আজ পর্যন্ত পেশ করিতে পারে নাই। অথচ এইরূপ গ্রন্থ অথবা ইহার কোন অংশের তুল্য কিছু পেশ করার জন্য কুরআন মজিদের চ্যালেঞ্জ আজও সোচ্চার রহিয়াছে। বস্তুতঃ কুরআন মজিদে বর্ণিত মানব জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধানের মোকাবেলায়, কোন পণ্ডিত বা দার্শনিক উৎকৃষ্টর কোন সমাধান আজও দিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না। ইহার কারণ এই যে, মানুষ নিজের আদিও জানে না এবং অন্তও জানে না। এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া একমাত্র তাহার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ত্রাণকর্তাই তাহাকে জীবন-বিধান দিতে পারেন এবং সেই জীবন-বিধানই কুরআন মজিদ।

গত ১৪০০ বৎসরে বহু ইযমের জন্ম হইয়াছে এবং দেশে দেশে বহু মহারথী জগত-বিধান দিবার দাবী ও দণ্ড লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং দেখিতে দেখিতে অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। নিজেদের রচিত মতবাদ ও বিধানের সহিত তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে, যাইতেছে এবং যাইবে। সকলের সকল প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে। জগতের ঘটনাবলী আজ কুরআন-করীমের শিক্ষার সত্যতার ও উপযোগীতার স্বীকৃতির দিকে দ্রুত ধাবমান হইয়া আসিতেছে। অচিরেই মানুষ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে যে, তাহাদের জীবনের সকল জরুরত একমাত্র কুরআন করীমই পূর্ণ করিতে পারে এবং ইহার শিক্ষা হইতে চুল পরিমাণ সরিলেও মানব-জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

(২) কুরআন করীম এক রুহানী-বিশ্ব এবং ইহজগত এক জড়-বিশ্ব। মানুষ রুহ্ ও জড়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট হইয়া এই জড় বিশ্বে স্থাপিত হইয়াছে, এবং কুরআন করীমের রুহানী বিশ্বের অভিষেক দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে। জড়-বিশ্বরে উপকরণ দ্বারা যেমন মানবের সকল জড় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তেমনি রুহানী-বিশ্ব 'কুরআন করীমের' শিক্ষার

দ্বারা তাহার সকল রুহানী প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা আছে। দেহ ও আত্মার সহ-অবস্থানের কারণে জড় উপকরণের সূক্ষ্ম প্রভাব যেমন দেহ ছাড়া আত্মার উপরেও ক্রিয়াশীল হয়, তেমনি রুহানী উপকরণের প্রভাব সূক্ষ্ম পন্থায় আত্মা হইতে তাহার দেহের উপরও ক্রিয়াশীল হয়। কুরআন করীমের শিক্ষা জড়-দেহ ও আত্মার সমন্বয়কে সংযত, সুস্থ, শান্ত, সুন্দর, সম্পূর্ণ ও কল্যাণকর করে। ইহার ব্যতিক্রম মানবের জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক। জড়-বিশ্বের সাথে রুহানী-বিশ্ব সদৃশ কুরআন করীমকে আল্লাহ্‌তায়ালা সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়াছেন। জড়-জগত যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট, তেমনি কুরআন করীম আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম। খোদাতায়ালার সৃষ্টি-রহস্য যেমন অফুরন্ত, তাঁহার কালামের তত্ত্বও তেমনি অফুরন্ত। উভয়ের অবস্থা অনুরূপ।

পার্থিব বিষয়ে মানুষের জ্ঞান ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং সে উন্নতি করিতেছে। কিন্তু এইরূপ ঘটিতেছে না যে জগতও দৈনিক নূতন হইতেছে। তাহার বর্ধিত জড়-জ্ঞানের সহিত তাহার অভাব বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু এরূপ হইতেছে না যে, তাহার বর্ধিত জড়-অভাব পূরণের জন্য নূতন জড় জগতের প্রয়োজন দেখা দিতেছে। একই পুরাতন জগতের রহস্য ও তত্ত্বাবলী নিত্য নৈমিত্তিক উদঘাটিত হইয়া তাহার সকল জড়-অভাব পূরণ করিয়া যাইতেছে।

রুহানী-জগত সদৃশ কুরআন করীমের নযুলের পর, কোন নূতন গ্রন্থের প্রয়োজন নাই। আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট জগত এবং আল্লাহ্‌তায়ালার কালামের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কুরআন করীম মানবকে জড় জ্ঞানের উন্নতির পথে কোন বাধার সৃষ্টি করে নাই। কুরআন-করীম মানবকে জড় গবেষণার দিকে জোরদার ভাষায় আহ্বান জানাইয়া ঘোষণা করিয়াছে: مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ "তুমি সৃষ্টির মাঝে কোথাও অসামঞ্জস্য দেখিবে না।" (সুরা মুল্‌ক-১ম রুকু)। পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا "ইহা যদি গয়ের আল্লাহ্‌র কথা হইত, তাহা হইলে ইহার মধ্যে বহু বিরোধী কথা থাকিত।" (সুরা নেসা-১১শ রুকু)। كِتٰبًا مُّتَشٰبِهًا مَّثَانِىَ 'এই গ্রন্থ সুমসঞ্জস ও বার বার বিবৃত'—(সুরা যুমর-৩য় রুকু)।

যেরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের সম্বন্ধে বর্ধিত জ্ঞানলাভের সহিত মানবের জাগতিক জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ও তাহার বর্ধিত অভাব পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তেমনি কুরআন-করীমের মধ্যে মানুষের চির উন্নতির জন্য সীমাহীন জ্ঞানের ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে। মানুষ যে পরিমাণ কুরআন করীমের গবেষণা করে এবং নিষ্ঠার সহিত اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া করিয়া যায়, তাহার নিকট সেই পরিমাণ ইহার গুপ্ত তত্ত্বাবলী উদঘাটিত হইতে থাকে। জড় বস্তুর নিত্য গবেষণার ফলপ্রসূত নব নব আবিষ্কারের দ্বারা যেমন মানবের বর্ধিত জাগতিক অভাব সহজেই পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তেমনি মানবের সতত প্রগতিশীল জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় হেদায়েত কুরআন করীমের রুহানী গবেষণার দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইতে থাকিবে। ইহার জন্য নূতন কোন ঐশী গ্রন্থের প্রয়োজন হইবে না।

অতএব কুরআন করীম শেষ ঐশীগ্রন্থ হওয়া সত্বেও জ্ঞানের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই, বরং পূর্বাপেক্ষা উন্নতির গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুরআন করীমের সুস্পষ্ট বাণী ইহার তসদীক করিতেছে। কুরআন মজিদে বর্ণিত আছে وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى অর্থাৎ "যাহারা হেদায়েত গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে পুনরায় আরও হেদায়েত দেন।" (সুরা মোহাম্মদ-২য় রুকু)। হেদায়েত কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তুর নাম নহে, বরং ইহা সত্যসমূহের এক সম্প্রসারনশীল শৃঙ্খলের নাম। উহার একটি কড়ি শেষ হইলে আর একটি কড়ি সম্মুখে আসে। অভিজ্ঞতা-মূলে ইহা পরীক্ষিত যে, ধর্মবিষয় এমন কোন মসলা নাই, যাহার দৃষ্টান্ত কুরআন করীমে নাই। এইরূপ মহা কল্যাণের অফুরন্ত ভাণ্ডার হস্তে লইয়া অন্য কোন গ্রন্থের প্রতীক্ষা করার দৃষ্টান্ত, সচ্ছ সলিলা নদীর কিনারায় থাকিয়া পানির তালাশে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হওয়ার ন্যায়।

কুরআন করীমের তফসীর শেষ হইবার নহে

বড়ই আশ্চার্য বোধ হয় ঐ সকল লোককে দেখিয়া, যাহারা দৈনিক اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া পড়ে অথচ ভাবে যে পূর্ববর্তী তফসীরকারকগণ যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছে তাহার পরে আর কিছু লেখা অবৈধ; তাহাদের বর্ণিত কুরআন করীমের ব্যাখ্যার বাহিরে আর কোন জ্ঞান নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া কেন বারবার করা হয়? তাহাদের আকীদা অনুযায়ী খোদাতায়ালার হাতে মানুষকে দিবার জন্য আর কিছু নাই। তাহাদের ধারণাকে বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, পুরাতন তফসীর সংগ্রহ করিয়া পড়িয়া লওয়া উচিত। খমাখা আর اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া পড়িয়া সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই।

সত্য কথা এই যে, বস্তু-জগতের ক্ষুদ্রতম পরমানু পর্যন্ত যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারীগণের নিকট নিত্য নূতন তথ্যের উপহার পেশ করিয়া যাইতেছে, তেমনি কুরআনী জগতেরও প্রত্যেক যের জবর, শব্দ ও আয়াত আধ্যাত্মিক গবেষণাকারীকগণের নিকট নিত্য নূতন তফসীর উপহার দিয়া যাইতে থাকিবে। বস্তুজগতের তথ্যের যেমন শেষ নাই, কুরআনী জগতের তফসীরও তেমনি শেষ হইবার নহে।

হেদায়েতে লাভের ক্ষেত্র ব্যাপক

প্রকৃতপক্ষে এই দোওয়া এরূপ পূর্ণাঙ্গীন যে, ধর্ম ও দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যাপারে ইহার সাহায্যে মানুষ উপকৃত হইতে পারে এবং যে কোন ধর্মের লোক ইহার দ্বারা ফায়দা হাসিল করিতে পারে। ইহাতে কেহ কোন ওজর পেশ করিতে পারে না। اهدنا الصراط المستقيم আয়াতে কেবল সঠিক এবং নির্দোষ পথ প্রদর্শনের যাচনা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন ধর্মের নাম নাই, কোন বিশেষ তরীকার উল্লেখ নাই, কোন নির্দিষ্ট উৎসের প্রতি ইঙ্গিত নাই। ইহাতে কেবল এবং কেবলমাত্র সত্য এবং নিরঙ্কুশ খাঁটি সত্য পাইবার আবেদন আছে। ইহাকে যে কোন ব্যক্তি নিজ আকীদা ও চিন্তাধারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া আবৃত্তি করিতে পারে। খ্রীষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, জরথুস্ত্রী, বৌদ্ধ, এমনকি একজন নাস্তিকও আলোচ্য আয়াতটি পড়ার বিপক্ষে কোন আপত্তি দেখাইতে পারে না। এক নাস্তিক খোদাকে মানে না, কিন্তু তাহার এ কথা বলিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না যে, যদি কোন খোদা থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করুন। সুতরং এই দোওয়া পূর্ণাঙ্গীন, নির্দোষ এবং সর্ব-সাধারণের। সকল মানুষের সকল অবস্থায় এই দোওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। পথ পাওয়ার জন্য এইরূপ প্রার্থনা করার সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, অন্য ধর্মের যে সকল লোক তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী এই দোওয়া করিয়াছে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের নিকট ইসলামের সত্যতা প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, যে কেহ খোলা মনে এই দোওয়া করিবে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার জন্য হেদায়েতের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

এক শিখের নূর দর্শন

এ সম্পর্কে তিনি এক ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। এক সময়ে তদানীন্তন ভারত গভর্ণমেন্টের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলদেও সিংহের পিতা তাঁহার নিকট এক বাহক মারফৎ পয়গাম পাঠান যে,

তিনি নূর লাভ করার জন্য বিভিন্ন ধর্মে তালাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোথাও নূর দেখিতে পান নাই। ইসলামে কি ইহার সন্ধান পাওয়া যায়? ইসলামে যদি ইহার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে তিনি ইহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। ইহার উত্তরে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাহাকে ৪০ দিন যাবৎ সর্বদা اهدنا الصراط المستقيم "এহদেনাস্ সেরাতাল মুস্তাকীম" আয়াত পাঠ করিতে বলেন এবং জানান যে তিনি যদি এই পরামর্শ মানিয়া চলেন, তাহা হইলে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিশ্চয় নূর দেখিতে পাইবেন। ৪০ দিন পরে বলদেও সিংহের পিতা সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, সত্যই তিনি নূর দেখিয়াছেন, কিন্তু সামাজিক কারণে তিনি মুসলমান হইতে পারিবেন না। বেচারার দুর্ভাগ্য। ইহার পর তিনি যদি নূর গ্রহণ করার জন্য শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে এই দোওয়া জারি রাখিতেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমানও হইতে পারিতেন। কিন্তু স্বহস্তে নিজের ভাগ্যের উপর তিনি যবনিকা টানিয়া দেন, ঐ দোওয়া পরিত্যাগ করেন এবং যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকা পছন্দ করেন এবং তিনি তিমিরেই থাকিয়া যান।

ইহা কখনও হইতে পারে না যে, দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান অথচ হেদায়েতের জন্য প্রার্থনাকারী তাঁহার দ্বার হইতে খালি হাতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবে।

এই আয়াতে সিরাত শব্দটির মধ্যে আর এক গভীর রুহানী তত্ত্ব নিহিত আছে। বার বার পথ চাহিয়া যাইতে শিক্ষা দিয়া আল্লাহ্তায়ালা আমাদের দৃষ্টিকে অনন্তের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। মানব যত উন্নতি ইহজীবনে বা পরলোকে লাভ করুক কোথাও তাহার গতি থামিবে না, কোন গৃহে সে আবদ্ধ হইবে না, সে ক্রমোন্নতির পথে চির-কালের যাত্রী। বিরামহীন তাহার যাত্রা। সে সফলতার পর সফলতা লাভ করিবে, মনযিলের পর মনযিল পার হইবে, পান্থ-নিবাসের পর পান্থ-নিবাস ছাড়িয়া যাইতে থাকিবে, এমন কি পরলোকেও সে সুরম্য মনস্নিগ্ধকর জান্নাত সমূহের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর সমূহ পার হইয়া যাইতে থাকিবে, কিন্তু কেহ এবং কিছুই তাহার এই অনন্ত যাত্রার গতিরোধ করিতে পারিবে না। মহান আল্লাহ্তায়ালার নিকট তাঁহার সীমাহীন সদা উজ্জলতর আলোকময় পথে চালানোর নিবেদন জানাইতে জানাইতে মানব অনন্তকাল চলিতে থাকিবে। পথেরও শেষ নাই, তাহার চলারও শেষ নাই এবং তাহার দোওয়ারও শেষ থাকিবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার প্রণীত ইসলামী উসুল কি ফিলসফী পুস্তকে (ইসলামী নীতি দর্শন—১৪৬—৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) লিখিয়াছেন, "এ সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালা বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۔

'পৃথিবীতে যাহাদের ঈমানের আলো ছিল, তাহাদের আলো কেয়ামতের দিন তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডাহিনে দৌড়াইতে থাকিবে। তাহারা সর্বদা ইহাই বলিবে, "হে খোদা! আমাদের আলোকে পূর্ণ করিয়া দাও এবং তোমার মাগফেরাতের মধ্যে আমাদিগকে গ্রহণ কর। তুমি সর্ব শক্তিমান।" (সুরা তহরীম—৯ম আয়াত)। এই আয়াতে যে বলা হইয়াছে, তাহারা সর্বদা ইহাই বলিতে থাকিবে, 'আমাদের আলোকে পূর্ণ করিয়া দাও' ইহা অসীম উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। অর্থাৎ নূরানীয়তের এক কামাল হাসিল করিবার পর আর এক কামাল তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন তাহারা দ্বিতীয় কামালের জন্য প্রার্থনা করিবে এবং উহা প্রাপ্ত হওয়ার পর এক তৃতীয় কামাল তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন উহা দেখিয়া তাহারা পূর্বের কামালগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে এবং পুনরায় তাহারা আরও কামালের আকাঙ্খা করিবে। ইহাই সেই উন্নতির আগ্রহ যাহা أَتْمِمْ (আতমেম অর্থাৎ পূর্ণ কর) শব্দ হইতে প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ এই প্রকারে অনন্ত উন্নতির ধারা চলিতে থাকিবে, কখনও অবনতি হইবে না এবং তাহারা বেহেশ্‌ত হইতে কখনও বহিষ্কৃত হইবে না। বরং প্রত্যহ তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে, তাহারা কখনও পিছনে হটিবে না।

উপরে যে সকল নূরানীয়তের কামালের কথা বলা হইয়াছে, উহা আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যের মর্যাদার স্তর সমূহ। এই প্রকার চির-প্রগতিশীল কামাল লাভের পথ কি? কুরআন মজিদের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট এই যে, উহা কোন প্রশ্ন, আদেশ, নিষেধ বা বিষয় বলার অব্যবহিত পূর্বে অথবা অব্যবহিত পরে, উহার জবাব, কারণ, যুক্তি বা সমাধান দিয়া থাকে। বর্তামান ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌তায়ালা "আমাদিগকে সরল সঠিক পথে চালাও" বলিবার পূর্বেই সেই পথের পূর্ণ সন্ধান দিয়াছেন। সেই পথ হইল সিরাতে মুস্তাকীম। এই সিরাতে মুস্তাকীম হইল পূর্বালোচিত খোদার দিকে যাইবার চারিটি মূল ধাপবিশিষ্ট রুহানী সোপান। মহামহিম অনন্ত জ্যোতির্ময় আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ সত্তার সিংহাসনে সর্বোচ্চে বিরাজমান। তাঁহার দিকে যাইতে মালেকীয়ত, রহীমীয়ত, রহমানীয়ত ও রবুবীয়তের ধাপ বাহিয়া উঠিতে হয়। এই চারিটি হইল আল্লাহ্‌তায়ালার মূল সেফাত। এগুলির বহু জানা ও অজানা শাখা আছে। উর্দ্ধে উঠার পন্থা হইল নিজের মধ্যে ঐ গুণাবলীর প্রকাশ করা। বান্দা যখন উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, তখন তাহার উন্নততর মর্যাদার যোগ্যতা লাভের

ক্ষণে ক্ষণে তিনি তাঁহার গুণাবলীর সোপান সমূহের উপর আলোক সম্পাতে পথ দেখাইতে এবং উন্নত-তর কামালের বিকাশ ঘটাইয়া যাইতে থাকেন এবং বান্দা উহা চাহিতে ও পাইয়া যাইতে থাকে।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -

সেই সকল লোকের পথ, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ (ঐ সকল লোকের পথে)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ০

নহে, যাহাদের উপর (পরে তোমার) গযব নাযেল হইয়াছে, এবং না (ঐ সকল লোকের পথে) যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে।

শব্দার্থ :— انعمت শব্দ انعام হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ, ফযল (অনুগ্রহ) করা বা বাড়ানো। এই শব্দ কেবল বিবেক-সম্পন্ন জীবের জন্য ব্যবহৃত হয়। গরু, ছাগল, ঘোড়া ইত্যাদি প্রাণীকুলের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয় না। কেহ এ কথা বলিবে না যে গরু ছাগলকে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। ইহা কেবল মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়।

غضب—الغضب শব্দের অর্থ, পাপের শাস্তি দিবার জন্য রক্ত টগবগ করিয়া ফুটা। অভিশাপ বা শাস্তি।

ولا الضالين এর মধ্যে ضال শব্দের অর্থ, সোজা রাস্তা হইতে স্খলিত হওয়া। কোন কাজে সর্বাত্মকভাবে নিমগ্ন হওয়া। কোন চিন্তায় বিভোর হওয়া। কাহারও প্রেমে বিলীন হওয়া। সাধারণতঃ এই শব্দ মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জন্য পবিত্র কুরআনে এই শব্দ ভাল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা ০ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى অর্থাৎ "তোমাকে যখন আমি আমার প্রেমে আত্ম-বিলীন দেখিলাম, তখন আমি স্বয়ং তোমাকে আমার দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া আনিলাম।" (সুরা আদ্-দুহা)।

তফসীর

চির উন্নততর মর্যাদা লাভ মোমেনের লক্ষ্য

সরল সঠিক সহজ পথ-প্রাপ্তির জন্য দোওয়া শিখাইবার পর ইহার সহিত আল্লাহ্তায়ালা এই দোওয়াও শামিল করিয়া দিলেন যে, সেই সকল লোকের পথে পরিচালিত কর যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ অর্থাৎ উহা যেন সাধারণ পথ না হয়, বরং উচ্চ মর্যাদা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পথ হয়।

পবিত্র কুরআনে প্রথম সুরাতেই মুসলমানদের সম্মুখে কিরূপ মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। একজন মোমেন কেবল সুপথ লাভ করিয়া বা কিছু নেকী করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে না, বরং সে তাহার লক্ষ্যকে উচ্চতর করিতে থাকিবে এবং পুরস্কার-প্রাপ্ত বান্দাগণের মর্যাদা লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিবে। সে এখানেও থামিবে না, বরং কুরআন করীমে বর্ণিত বিশেষ মর্যাদা-প্রাপ্ত বান্দাগণের সঙ্গী হইবার চেষ্টা করিবে। আল্লাহ্তায়ালার প্রেমিকগণ ছোট মর্যাদায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। কারণ তাঁহার প্রেম বান্দার অন্তরে এরূপ প্রসারতার সৃষ্টি করে যে, সে সাধারণ উন্নতিতে তুষ্ট থাকিতে পারে না। খোদাতায়ালার সন্ধান লাভের পর এমন কোন্ বস্তু আছে যাহা তাহাকে পরিতৃপ্তি দিতে পারে? যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার সন্ধানে রত, সে সর্ব প্রকার উন্নতিতে ব্রতী। যে খোদাতায়ালাকে সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে, সে কোন উন্নতিকেই শেষ বলিয়া মনে করে না। কিন্তু মোমেনের জন্য ইহা অপেক্ষা বড় আনন্দের বিষয় এই যে, ঈদৃশ উন্নতির আকাঙ্খা একা তাহার অন্তরেই উদ্বেল নহে, বরং তাহার রবের পক্ষ হইতেও এই শিক্ষা দান করিয়া বলা হইয়াছে, 'স্মরণ রাখিও, কোন ছোট মর্যাদায় সন্তুষ্ট হইও না। আমার নিকট কল্যাণ চাহ, কিন্তু সাধারণ কল্যাণ নহে, বরং সেই কল্যাণ, যাহা পুরস্কার-প্রাপ্ত বান্দাগণ লাভ করিয়াছিলেন। মাত্র সাধারণভাবে পুরস্কার-প্রাপ্ত বান্দাগণের ন্যায় নহে, বরং সর্বপ্রকার পুরস্কারে ভূষিত বান্দাগণের ন্যায় পুরস্কৃত হইতে চেষ্টা কর।'

اَنْعَام বা পুরস্কার বলিতে কোন বিশেষ বস্তুকে বুঝায় না। সন্তোষ প্রকাশ করিতে কাহাকেও যে জিনিস দেওয়া হয়, উহাকে এন্আম কহে। উহা দ্বীনী বা জাগতিকও হইতে পারে। কুরআন করীমেও এই শব্দ ব্যাপক অর্থে আসিয়াছে। اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهٖ - অর্থাৎ 'আমি যখন মানুষের উপর কোন এন্আম করি, তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং এক পার্শ্বে সরিয়া যায়।' (সুরা বনি ইসরাইল—৯ম রুকু)। ইহার অর্থ এই যে, এন্আমের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরিবর্তে মানুষ খোদার সম্বন্ধে গাফেল হইয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এন্আমের অর্থ—বিদ্যা, বুদ্ধি, পার্থিব সম্মান ইত্যাদিকেও বুঝায়। কারণ এই সকল বস্তুর দানের সহিত কৃতজ্ঞতার কথা জড়িত আছে। দেখা যায় এই সব কল্যাণ লাভের পর অনেকে খোদা-তায়ালার দিকে মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে গাফেল হইয়া যায়।

বিপদাপদ হইতে রক্ষা পওয়াকে কুরআন মজিদে নে'মত বলা হইয়াছে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ -

অর্থাৎ "হে মোমেনগণ! আল্লাহ্তায়ালার নে'মতকে স্মরণ কর, এক জাতি (কু-অভিপ্রায়ে) তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তিনি তাহাদের হস্তকে তোমাদের (নিকট পৌঁছা) হইতে রুখিয়া দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্তায়ালাকে ভয় কর, এবং মোমেনদের কর্তব্য আল্লাহ্তায়ালার উপর ভরসা করা।" (সুরা মায়েদা—২য় রুকু)। এই আয়াতে দুশমনগণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়াকে নে'মত বলা হইয়াছে।

আল্লাহ্তায়ালার প্রত্যেক অনুগ্রহ পুরস্কার হইলেও, কতকগুলি খাস অনুগ্রহ নে'মত নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। কারণ ঐগুলি অনুগ্রহরাজির মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। কুরআন-করীমে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ০

অর্থাৎ "সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন মুসা (আঃ) নিজ কওমকে বলিলেন, হে আমার কওম! আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে নে'মতে ভূষিত করিয়াছেন, উহা সদা স্মরণ রাখিও। সেই নে'মত হইল তোমাদের মধ্য হইতে তিনি নবী গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে বাদশাহ বানাইয়াছেন এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহা অন্য জাতি-গণের মধ্যে কাহাকেও দেন নাই।" (সুরা মায়েদা—৪র্থ রুকু)। মানুষের জন্য যেগুলি নে'মত উহা এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে এগুলির মধ্য হইতে প্রচুর অংশ ইহুদীগণকে দেওয়া হইয়াছে।

মানুষের কামালাত তিন প্রকার হইয়া থাকে। যথা (১) ব্যাক্তিগত পার্থিব, (২) ব্যক্তিগত ধর্মীয় ও রুহানী এবং (৩) আপেক্ষিক পার্থিব এবং ধর্মীয় ও রুহানী কামালাত।

তৃতীয় দফায় বর্ণিত কামালাত ব্যক্তি বা জাতির দ্বারা সঙ্গী বা প্রভাবাধীন জনগণের উপর অর্জিত প্রাধান্যকে বুঝায়।

উপরে উদ্ধৃত আয়াতে হযরত মুসা (আঃ) বনি ইসরাইলকে প্রদত্ত তিন প্রকারের কামালাতের উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে পার্থিব কামালাতে ভূষিত করেন। ফলে তাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ বাদশাহাতের অধিকার ভোগ করিতে থাকে। পার্থিব কামালাতের পূর্ণতার জন্য বাদশাহাতের প্রয়োজন। যে জাতি বাদশাহাতের অধিকারী হয়, পার্থিব উন্নতির সর্বপ্রকার উপকরণ তাহাদের হস্তগত হয়। অতঃপর এই সব উপকরণের সদ্ব্যবহার করা বা না করা তাহাদের কাজ। সুতরাং কোন জাতিকে দীর্ঘকাল যাবৎ বাদশাহাতের অধিকারী করার অর্থ হইতেছে পার্থিব উন্নতির সকল পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া।

(২) বাদশাহাত যেমন পার্থিব উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় এবং চরম সুযোগ-স্থল, তেমনি ধর্মীয় ও রুহানী সাফল্য অর্জনের চরম উপায় হইল নবুওত। হযরত মুসা (আঃ) তাঁহার কওমকে বলিতেছেন যে, সেই উৎকৃষ্ট উপায় এবং চরম নে'মত তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা বনি ইসরাইলকে এক বা দুইজন নবী দেন নাই, বরং তাহাদিগকে দীর্ঘকাল যাবৎ ধারাবাহিকভাবে নবুওতের কল্যাণে ভূষিত করিয়াছিলেন।

(৩) তৃতীয় এন্‌আম হইল আপেক্ষিক। অর্থাৎ ইহুদীগণকে কেবল পার্থিব ও ধর্মীয় নে'মত সমূহই দেওয়া হয় নাই, বরং তুলনামূলকভাবে অপরাপর জাতি অপেক্ষা বেশী দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে তাহারা সমসাময়িক জাতি সমূহের উপর প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। হযরত মুসা (আঃ)-এর وَاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ বাক্যে আল্লাহ্‌তায়ালা এই ঘটনাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি বনি ইসরাইল কওমকে কেবল স্বায়ত্ত-শাসনের বাদশাহাতই দেন নাই বরং সাম্রাজ্যও দিয়াছিলেন, যদ্দারা তাহারা অপর জাতিগণের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে তিনি শুধু নবুওতই দেন নাই, বরং এইরূপ আম্বিয়া দিয়াছিলেন, যাহারা অপরাপর নবীগণের জন্য পথ প্রদর্শক স্বরূপ ছিলেন এবং যাহাদের অধীনে বহু নবী আসিয়াছিলেন। সুতরাং বনি ইসরাইল জাতি তিন প্রকারের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল, যথা (১) পার্থিব ও (২) ধর্মীয় এবং (৩) উভয় বিষয়ে অপরাপর জাতির উপর প্রাধান্য সম্বলিত। হযরত মুসা (আঃ)-এর আলোচ্য উক্তিতে মুসলমানগণের জন্য সবক রহিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের জন্যও একই জাতীয়

কল্যাণ-সমূহ রাখিয়াছেন। অতএব তাহারা যেন তাহাদের লক্ষ্যকে উচ্চ করে। এই বক্তব্যই اهدنا الصراط المستقيم আয়াতের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। اهدنا الصراط المستقيم আয়াতের সহিত صراط الذين انعمت عليهم আয়াত সংযুক্ত হইয়া অর্থের মধ্যে ব্যাপকতার সৃষ্টি করিয়াছে। এই আয়াত একজন মুসলমানের জন্য এই লক্ষ্যই শুধু নির্ধারণ করে নাই যে, সে কেবল নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সোজা পথ চাহিবে বরং সে উচ্চ পর্যায়ের কল্যাণসমূহ লাভ করিবার জন্যও দোওয়া করিবে, যেরূপ পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হইয়াছিল। সে এই প্রার্থনাই করিবে না যে, 'আমাকে নে'মত-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শামিল কর', বরং সে ইহাও দোওয়া করিবে, যেন সে হেদায়েতের সেই সব তরীকা, শিক্ষা এবং তত্ত্বজ্ঞান অধিকতরভাবে লাভ করে, যাহা পূর্ববর্ত্তী পুরস্কার প্রাপ্তগণ লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণের সম্মুখে এই উচ্চ আদর্শ রাখিয়া এবং তাহাদের অন্তরে এই আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের উপর বড়ই এহ্সান করিয়াছেন।

মুসলমানগণের জন্য নে'মত-সমূহ

এই সুমহান ও সুস্পষ্ট শিক্ষার মধ্যে মুসলমানগণের জন্য যে সর্বপ্রকার উন্নতির দুয়ার খোলা আছে, তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু মুসলমানগণের মধ্যে সাধারণভাবে নৈরাশ্য ছাইয়া গিয়াছে, সেহেতু কুরআন-করীম এই হেদায়েত চাওয়ার কি অর্থ করিয়াছে এবং এই দোওয়ার কবুলিয়তের কোন ওয়াদা কুরআন করীমে আছে কি না, তাহার আলোচনা করিব। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন,

وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۝ وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ
مِّنْ لَّدُنَّا اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ
فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ -
وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝

অর্থাৎ "যদি দুর্বল মুসলমানগণ অবাধ্যতা পরিত্যাগ করিয়া সত্যিকার আনুগত্যের নমুনা দেখায় (এবং) তাহাদিগকে যেরূপ আদেশ করা হয় তদনুযায়ী কাজ করে, তাহা হইলে

ইহার ফল তাহাদের জন্য উত্তম হইবে এবং তাহাদের ঈমান মযবুত হইবে এবং আল্লাহ্তায়ালার দরবার হইতে তাহারা উত্তম নে'মত প্রাপ্ত হইবে এবং আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে সেরাতে মুস্তাকীম দেখাইবেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহারা আল্লাহ্ এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুগামী হইবে, তাহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা নে'মত-প্রাপ্তগণের অর্থাৎ নবীগণের, সিদ্দীকগণের, শহীদগণের এবং সালেহ্গণের অন্তর্ভুক্ত করিবেন, তাহারাই উত্তম সঙ্গী।" (সুরা নেসা-৯ম রুকু)। আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানগণের জন্য যে নে'মতসমূহ নির্ধারিত করিয়াছেন, এখানে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এখানেও সুরা ফাতেহায় বর্ণিত হেদায়েত সেরাতে মুস্তাকীম এবং নে'মত-প্রাপ্তগণের উল্লেখ আছে। অধিকন্তু এখানে নে'মত-প্রাপ্তগণের পরিচিতি উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ্। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা ইহা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, সুরা ফাতেহায় মুসলমানদিগকে যে সকল নে'মত চাহিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, ধর্মের দিক দিয়া সেগুলি উচ্চ পর্যায়ের রুহানী মোকাম অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহের মোকাম। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা এই ওয়াদা দিয়াছেন যে, এই সকল মোকাম মুসলমানগণকে দেওয়া হইবে।

অনেকে আপত্তি তুলিয়া বলে যে এই আয়াতে مع الذين انعم الله عليهم—বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মুসলমানগণ নে'মতপ্রাপ্ত দলের সঙ্গী হইবেন বলা হইয়াছে, তাহারা প্রকৃতই ঐ সব মর্যাদায় আখ্যায়িত হইবেন ইহা বলা হয় নাই। যদি নবী ইত্যাদি শব্দের পূর্বে কেবল مع "সহিত" শব্দ থাকিত, তাহা হইলে হয়ত ইহা বলা যাইতে পারিত যে, উম্মতে মোহাম্মদীতে নবী ইত্যাদি হইবে না এবং এইরূপ লোক হইবে, যাহারা তাঁহাদের সহিত সাধারণ সঙ্গী হইবে। কিন্তু কুরআন করীমে مع "সহিত" শব্দের সঙ্গে انعم الله عليهم অর্থাৎ "যাহাদিগকে আল্লাহ্ নে'মতে ভূষিত করিয়াছেন" সংযুক্ত করিয়া সঙ্গ অবস্থার স্বরূপকে নে'মতের রঙে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ মুসলমানগণকে নবী ইত্যাদি দলের শুধু সঙ্গী করা হইবে না, বরং তাহাদিগকে সত্যিকার ভাবে তাহাদের সম মর্যদা-প্রাপ্ত সঙ্গী করা হইবে। وحسن اولئك رفيقا অর্থাৎ "তাহারা উত্তম সঙ্গী হইবে" বাক্যে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে। ইহা না হইলে وحسن اولئك رفيقا মুসলমানগণের জন্য সুসংবাদ ও অভয়বাণী না হইয়া ব্যাঙ্গোক্তি হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ইহা অনস্বীকার্য যে, মুসলমানগণের মধ্যে বহু সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ হইয়াছেন। তাহারা কোন্ ওয়াদার ভিত্তিতে এই সব মর্যদা লাভ করিয়াছেন? নিশ্চয় আলোচ্য আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী এই সব মর্যাদা লাভ হইয়াছে। কিন্তু ওয়াদাকৃত মর্যাদাগুলির মধ্যে নবুওত সর্বোত্তম এবং উক্ত আয়াতে ইহার উল্লেখ প্রথমেই আসিয়াছে। সুতরাং ওয়াদার শেষোক্ত তিনটি ফল যখন সকলে

প্রত্যক্ষ ও স্বীকার করিয়াছে, তখন প্রথম নে'মতটি হইতে মুসলমানগণকে বঞ্চিত করার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। এরূপ কদর্থ করিলে মুসলমানদের মধ্যে সিদ্দীক, শহীদ, সালেহের আবির্ভাবও বাতিল হইয়া যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার ওয়াদা অনুযায়ী উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-কে নবুওতের নে'মতে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহাকে ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। ইসলামে সিদ্দীক, শহীদ, সালেহগণ যেরূপ উম্মতি ছিলেন, তিনিও তদ্রূপ উম্মতি এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্ণ এতায়েতকারী। আলোচ্য আয়াতেও এই ওয়াদাই দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের এতায়েতের ফলে উল্লিখিত চারটি মর্যাদা লাভ হইবে। সুরা ফতেহায় মুসলমানগণকে নে'মত প্রাপ্তির ও উন্নতির পর উন্নতির জন্য সহজ ও সরল পথের দোওয়া শিখাইয়া এবং সুরা নেসার আলোচ্য আয়াতে এই সকলই দিবার নিশ্চিত ওয়াদা দিয়া যদি খোদাতায়ালা তাহাদিগকে কিছুই না দিতেন, তাহা হইলে কুরআন (নউযুবিল্লাহ্) এক নিরর্থক গ্রন্থ হইত।

নবুওত জাতীয় নে'মত — যোগ্য ব্যক্তি লাভ করে

অনেকে আপত্তি করিয়া থাকে যে, নবুওত موهبت অর্থাৎ অযাচিত দান كسبى কর্ম দ্বারা অর্জিত নহে। অতএব ইহার জন্য দোওয়ার কি প্রয়োজন। ইহার প্রথম উত্তর এই যে, মানুষ নবুওত লাভের জন্য দোওয়া করে না। উম্মতে মোহাম্মদী এই দোওয়া করে যে, আল্লাহ্তায়ালা যেন তাহাদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর এন্আমে ভূষিত করেন। ইহার পর আল্লাহ্তায়ালা যাহাকে যে নে'মতে চাহেন, ভূষিত করিবেন। কুরআন করীমে আসিয়াছে اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ অর্থাৎ "আল্লাহ্ উত্তম জানেন কোথায় তিনি রেসালত স্থাপন করিবেন।" (সুরা আনআম—১৫ম রুকু)। নবুওত অযাচিত দান, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঠক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি, এ দান আবু জেহেলের উপর কেন অবতীর্ণ হয় নাই এবং হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর কেন নাজেল হইল? অযাচিত দানকে আকর্ষণ করিবার জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। কোন নে'মত লাভ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা প্রথম শর্ত। নচেৎ নে'মত আযাবে পরিণত হইতে বাধ্য। দ্বিতীয় উত্তর এই যে,—কুরআন করীমে মোমেনকে কোথায় নির্দিষ্ট ভাবে এই দোওয়া শিখানো হইয়াছে যে, আমাকে নবুওত দাও? রুহানী নে'মত সমূহের জন্য দোওয়া করা তো দূরের কথা, পার্থিব বিষয়ের জন্যও অনেক সময় ইহা অপছন্দনীয় ও

ঘৃণ্য হইয়া থাকে। কোন ছুতার যদি দোওয়া করিতে আরম্ভ করে, 'হে আল্লাহ্! আমাকে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করিয়া দাও," কিম্বা কোন পঙ্গু যদি দোওয়া করে, "হে আল্লাহ! আমাকে ফৌজের সিপাহ্-সালার করিয়া দাও," কিম্বা কোন শকট-চালক দোওয়া করে, "হে আল্লাহ্! আমাকে বোইং উড়ো জাহাজের পাইলট করিয়া দাও," এবং আল্লাহ্তায়ালা এই সব দোওয়া কবুল করেন, তাহা হইলে অবস্থা কি দাঁড়াইবে? এই জাতীয় দোয়া করা অসঙ্গত ও অবান্তর। স্বর্গীয় বিধানে পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী দোওয়া কবুল হয়। সুতরাং মোমেনের জন্য ইহা বিধেয় নহে যে সে কোন বিশেষ রুহানী মোকামের নাম লইয়া নিজে উহা পাইবার জন্য দোওয়া করে। নবুওতের কথা দূরে থাক, যদি কেহ এ দোওয়াও করে, 'হে আল্লাহ্! আমাকে সিদ্দীক বানাইয়া দাও, আমাকে কুতুব বানাইয়া দাও বা শহীদ বানাইয়া দাও,' তাহা হইলে ইহাও অপছন্দনীয় হইবে। এই জন্যই আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে اهدنا অর্থাৎ "আমাদিগকে পথ প্রদর্শন কর" শিখাইয়াছেন, اهدني অর্থাৎ "আমাকে পথ প্রদর্শন কর" বলিতে নির্দেশ দেন নাই। এস্থলে বহুবচন শব্দের ব্যবহার জাতীয় উন্নতি নির্দেশ করিতেছে। জাতির মধ্য হইতে আল্লাহ্তায়ালা যাহাকে যে নৈকট্যের মোকামের যোগ্য দেখেন, তাহাকে সেই মোকামের জন্য বাছিয়া নেন। পুনঃরায় এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা দোওয়া করি নে'মত লাভের জন্য। নবুওতও এক নে'মত। সুতরাং এই দোওয়াকে যদি জাতির জন্য নবুওত লাভের দোওয়া বলিয়া নির্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তির প্রশ্ন উঠে না। সার কথা এই যে, খোদাতায়ালা আমাদিগকে সকল প্রকার নে'মত হাসিল করার জন্য এবং সকল কাজে সঠিক পথ-প্রদর্শনের জন্য দোওয়া শিখাইয়াছেন। কুরআন করীমে ওয়াদা রহিয়াছে যে, মুসলমানগণকে সর্বপ্রকার নে'মত দেওয়া হইবে এবং নে'মত সমূহের মধ্যে নবুওতের নাম প্রথমে রাখা হইয়াছে। সুতরাং এই নে'মতকে বাদ দিবার অধিকার কাহারও নাই।

খাতামান্নবীয়ীনের পর অনুগামী নবী

এখানে আর এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) যেহেতু খাতামান্নবীয়ীন, তাঁহার পর কিরূপে নবী আসিতে পারে। এই আপত্তির খণ্ডন সুরা নেসার আলোচিত আয়াতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ আয়াতে من يطع الله والرسول বাক্যে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ এবং আঁ-হযরত (সাঃ) এর এতায়াতকারীগণ এই নে'মত পাইবেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, যিনি অনুগামী হইবেন, তাহার কাজ আঁ-হযরত (সাঃ)-

এর কাজ হইতে পৃথক হইতে পারে না। সুতরাং যে নবী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুগামী হইবেন, তিনি তাঁহার বিরোধী হইবেন না, বরং তাঁহার শিক্ষার ব্যাখ্যাকে পূর্ণ করিবেন।

এক তফসীরকারক লিখিয়াছেন যে, "যদি এই দোওয়া নবুওত লাভ করিবার জন্য হইত, তাহা হইলে কমপক্ষে ইহা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে নবুওতের মোকামে খাড়া করিবার পূর্বে শিখানো উচিৎ ছিল। কিন্তু কুরআন মজিদে এই দোওয়া আসার অর্থ হইতেছে যে, তাঁহাকে নবুওত দানের পরে এই দোওয়া শিখানো হইয়াছে। অতএব এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই দোওয়া নবুওত লাভের জন্য শিখানো হয় নাই।" বড় অদ্ভুত এই যুক্তি। না চাহিতে আল্লাহ্তায়ালা মহাদান করিলেন এবং দান চাহিতে শিখাইয়া তিনি দানের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন। এমন দাতাও বড় অদ্ভুত ধরণের। বস্তুতঃ এইরূপ যুক্তি অসার এবং ইহা তফসীরকারকের সঙ্কীর্ণ ও বিদ্বেষী মনের পরিচায়ক। اهدنا الصراط المستقيم আয়াতের মধ্যে যে দোওয়া শিখানো হইয়াছে, উহা মানব মনের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। কুরআনী কথা বরকতময় এবং ইহার ভাষা পূর্ণাঙ্গীন এবং সর্ব-প্রকার ত্রুটি হইতে পবিত্র। যে কোন ধর্মের অনুসারীর মনে সত্য লাভের জন্য যদি আকাঙ্খা জাগে, তাহা হইলে সে অনুরূপ অর্থ-বোধক ভাষায় আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোওয়া করিবে। সে বলিবে, "হে আল্লাহ্! আমাকে সোজা পথ দেখাও, তোমার প্রিয় বান্দাগণের পথ।" কোন জ্ঞানী মানুষ কি একথা মানিতে পারে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মনে নবুওতের পূর্বে পথ পাইবার জন্য অনুরূপ আকাঙ্খা জাগে নাই? এইরূপ ধারণা মানুষকে কাফের বানাইয়া দেয়। প্রত্যেক নবী এবং নেক মানুষের মনে সৎপথ লাভের আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক। হযরত রসুল করীম (সাঃ) যে ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না, তাহা তাঁহার জীবন পাঠেই জানা যায়। তিনি নবুওত লাভের পূর্বে কোন্ কাজে হেরা গুহায় অবস্থান করিতেন?

আল্লাহ্তায়ালাকে জানিবার, মানিবার এবং পাইবার জন্য আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হৃদয়ে যে আকুল বেদনা জাগিয়াছিল, উহা তাঁহার ফযলকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার মনের ব্যাকুল ডাক আল্লাহ্তায়ালার ভাষায় اهدنا الصراط المستقيم আয়াতে রূপায়িত হইয়াছে। এ ভাষা তাঁহার ছিল না, কিন্তু নবুওত লাভের পূর্বে তাঁহার হৃদয়কে যে ভাব অহরহ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, এই আয়াতে উহা প্রতিফলিত হইয়াছে। মানুষের ভাষায় তাহার মনোভাবের পূর্ণ প্রকাশ হয় না, কিন্তু কুরআনের ভাষা অপূর্ব মাধুর্য-পূর্ণ। ইহার শব্দচয়ন অনুপম ও ত্রুটিহীন, মনের পূর্ণ ও ব্যাপক ভাব-প্রকাশক, আগ্রহ ও আশা উদ্দীপক এবং নিশ্চয়তা-

বিধায়ক। এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে দিয়া আসিয়াছি, তাহাই এই কথা উপলব্ধি করিবার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে না চাহিতে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব প্রকার উপকরণ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। জড়-উপকরণ সমূহের ব্যবহারকে তিনি আমাদের বাঁচিয়া থাকার সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাই আমরা বাঁচিয়া থাকার তাকিদে সেগুলির ব্যবহার করিতে বাধ্য এবং উহা ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আধ্যাত্মিক উপকরণ ভিন্নরূপ। জড়-জীবনে বাঁচিয়া থাকার জন্য উহাদের জরুরত নাই। সেই জন্য ধর্ম পালনকে আল্লাহ্তায়ালা জবরদস্তিমূলক ভাবে চাপাইয়া দেন নাই। لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ, ধর্মে কোন জবরদস্তি নাই। ইহা স্বেচ্ছামূলক। সেই জন্য এই ব্যাপারে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যাহার মনে এ বিষয়ে যত বেশী আগ্রহ এবং আমলে উৎকর্ষতা থাকে, তাহার প্রতি আল্লাহ্তায়ালা তত বেশী মনোযোগী ও অনুগ্রহশীল হন। সুতরাং, আঁ-হযরত (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার নিকট সত্য পথ চাহেন নাই, তথাপি তিনি জবরদস্তি তাঁহাকে নবুওত দিয়াছিলেন, এমন কথা বলা সম্পূর্ণ বাতুলতা এবং ইহা আল্লাহ্তায়ালার বিরুদ্ধে এক আপত্তিকর হামলা।

পুনঃ তফসীরকারকের আপত্তি 'না চাহিতে যাহা আসিয়া গিয়াছে, পরে উহার আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, اهدنا الصراط المستقيم দোওয়ায় উহার দুয়ার খুলিবে না' ইহা যদি যুক্তি-যুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উপর কুরআন করীম নাযেল হওয়ার পূর্বে তিনি কি সৎ ও সাধু ছিলেন না? তিনি কি আল্লাহ্র প্রেমিক ছিলেন না? যদি ইহার উত্তর "হাঁ" হয়, এবং নিশ্চয় "হাঁ", তাহা হইলে লোকে বলিতে পারে যে, কুরআন করীমের উপর আমল ছাড়াই যদি তিনি সৎ, সাধু এবং আল্লাহ্র প্রেমিক হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা হইলে নামায রোযা, হজ্জ, ইত্যাদি পালনের কি প্রয়োজন আছে, তাহাদেরও বিনা শরীয়তে তকওয়া লাভ হইয়া যাইবে। দুনিয়ার ব্যাপারেও ডিম না মুরগী আগে, বীজ আগে না গাছ আগে প্রশ্ন তুলিয়া যদি কেহ বলে যে, প্রথমে যেমন আপনা-আপনি সব হইয়াছে, এখনও ঐরূপ হইবে, অযথা প্রাকৃতিক নিয়ম মানিয়া ঐ সবের উৎপাদনের জন্য মেহনত করার কি প্রয়োজন, তাহা হইলে কেহ তাহাকে সুস্থবুদ্ধি-সম্পন্ন বলিবে না। বস্তুতঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে দুনিয়া হইতে সততা ও সাধুতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তিনি সততা ও সাধুতার পূর্ণ প্রতীক ছিলেন। নবুওত লাভের পূর্বে তাঁহার আল-আমীন খেতাব প্রাপ্তি ইহার অকাট্য প্রমাণ। তাঁহার পবিত্র আত্মায় আল্লাহ্তায়ালার প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার অন্তরের

আকাঙ্খা অনুযায়ী তাঁহার হৃদয় হইতে যে আকুল প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিয়া তাঁহার যবানে বিশেষ কোন প্রার্থনা ব্যক্ত না হইলেও, তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন এবং তাঁহাকে এক পূর্ণ শরীয়ত দান করিলেন, যাহা পালনে যোগ্যতানুযায়ী সর্বপ্রকার নে'মত লাভ হইবে। ইহার পর শরীয়তের নির্ধারিত আইন কানুনের বাহিরে কোন প্রকার সফলতা লাভ আর সম্ভব নহে।

উক্ত আপত্তির বিরুদ্ধে আরও প্রশ্ন উঠে। নবী কি শুধু একটি পদের নাম, না উহার জন্য তকওয়া পবিত্রতা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য অর্জনের কোন শর্ত আছে? আরও প্রশ্ন উঠে যে, একজন গয়ের-নবী কি একজন নবীর চেয়ে বেশী মুত্তাকি, পবিত্র এবং বেশী ঐশী-নৈকট্য প্রাপ্ত হইতে পারে? যদি তফসীরকারক ও তাহার অনুসারীগণ উহার উত্তরে হ্যাঁ" বলে, তাহা হইলে উহা শুধু অর্থহীন বাক্‌বিতণ্ডায় পর্যবসিত হইবে। কিন্তু উত্তর যদি নেতিবাচক হয় অর্থাৎ গয়ের-নবী, নবী অপেক্ষা বেশী মুত্তাকী, বেশী পবিত্র ইত্যাদি হইতে পারে না, তাহা হইলে তো, যাহারা বলে যে, উম্মতে মোহাম্মদীতে যিল্লি, বুরুযী এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুগত নবী আসিতে পারে না, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই বলে যে, এই উম্মতে কেহ আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য প্রাপ্ত হইবে না এবং যে মোকামে পূর্ববর্তীগণ পৌঁছিয়াছিলেন, সেই মোকামে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের কেহ পৌঁছিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি এইরূপ বিশ্বাস রাখে, সে উম্মতে-মোহাম্মাদীকে নে'মত-প্রাপ্ত উম্মতের পরিবর্তে এক বঞ্চিত উম্মত মনে করে।

উক্ত তফসীরকারক আর এক প্রশ্ন করিয়াছে যে, গত তেরশত বৎসর যাবৎ এ উম্মতে একজনেরও কি দোওয়া কবুল হইল না এবং একজনও নবী হইলেন না কেন? ইহার উত্তর এই যে, দোওয়ার কবুলীয়ত দোওয়ার পরিমাণ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী হইয়া থাকে। যুগের জন্য নবুওতের প্রয়োজন না হইলে নবীর আবির্ভাব হয় না। তফসীরকারক ইহা স্বীকার করেন যে, এই উম্মতে সিদ্দীকীয়তের মোকাম লাভ হইতে পারে। তাহাকে প্রশ্ন করি যে, এই উম্মতে কতজন সিদ্দীকীয়তের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন? যদি গত তের শত বৎসরে মাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে একই প্রশ্ন উঠে যে, সুদীর্ঘ তের শত বৎসরে কি আর এক জনেরও দোওয়া কবুল হইল হইল না? যদি বলেন যে, আরও অনেকে এই মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে, তাহারা কি হযরত উমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী অপেক্ষা বড় ছিলেন অথবা ছোট। যদি তাঁহারা ছোট হন, তাহা হইলে

ইহা কিরূপ কথা যে, কম মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি সিদ্দীক হইয়া গেলেন এবং বড় মর্যাদার লোক শহীদের স্তর পর্যন্ত উন্নতি করিয়াছিলেন কিন্তু সিদ্দীক হইতে পারেন নাই।

সুতরাং যে আপত্তি নবুওত লাভের বিরুদ্ধে পেশ করা হয়, সিদ্দীকীয়তের দুয়ার খোলা রাখিলে, একই আপত্তি উত্থাপিত হইবে।

মানব জাতি ও পবিত্রাত্মার সম্মিলিত ক্রন্দন হেদায়েতকে আকর্ষণ করে

এই আয়াত সম্বন্ধে আর একটি তত্ত্ব বলা প্রয়োজন মনে করি। হযরত রসুল করীম (সাঃ) সুরা ফাতেহার যতগুলি নাম বলিয়াছেন, উহাদের মধ্যে দুইটি হইল উম্মুল কুরআন এবং উম্মুল কেতাব। (আবু দাউদ)। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তাঁহার দৃষ্টিতে এই দুই নাম কুরআন হইতে লওয়া হইয়াছে এবং আলোচ্য আয়াত হইতেই লওয়া হইয়াছে। এই আয়াত এবং ইহার পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ইলাহী এবাদতের শেষ মনযিল হইল মানুষ পুরস্কার-প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দোওয়া করিবে। যখন জাতি সমষ্টিগত ভাবে দোওয়া করিবে যে, আমাদের জন্য হেদায়েতের রাস্তা খুলিয়া দাও এবং ইহার সহিত যুগের পূর্ণ এবং পবিত্র আত্মার আবেগভরা দোওয়া সংযুক্ত হইবে, তখন আল্লাহ্তায়ালার রহমত উদ্বেল হইয়া উঠিবে এবং তাঁহার ফযল ইলহাম ও হেদায়েতের আকারে নাযেল হইবে। প্রত্যেক যুগে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে এবং ঘটিয়া যাইতে থাকিবে।

নূহ (আঃ)-এর যুগের উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের দোওয়া হযরত নূহ (আঃ)-এর পবিত্র আত্মার কান্নার সহিত মিলিত হইয়া আল্লাহ্তায়ালার কালামকে তাঁহার উপর আকর্ষণ করিয়াছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর যুগের আত্মাগুলির ক্রন্দন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পবিত্র ও বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সকরুণ ডাকের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার উপর সোহোফা বা ধর্মশাস্ত্র নাযেল হওয়ার কারণ হইয়াছিল, একই ঘটনা হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে ঘটিয়াছিল। ইহাই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যুগে ঘটে। কুরআন করীমের নযুলের পূর্বে তিনি সংসার হইতে পৃথক হইয়া হেরা গুহায় গিয়া দোওয়া ও এবাদতে তন্ময় থাকিতেন। ইহা ছিল সেই যুগের পবিত্র-আত্মার অবস্থা। অন্যদিকে নিপীড়িত বিশ্বের করুণ হা-হুতাশ উর্ধে উঠিতেছিল। সবার মিলিত নিবেদনের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্তায়ালার করুণাসিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠে এবং কুরআন করীম নাযেল হয়। বস্তুতঃ যে কোন যুগে আল্লাহ্তায়ালার হেদায়েত নাযেল হওয়ার পূর্বে দুনিয়ার যে অবস্থা হয়, বিশেষ করিয়া যুগের পবিত্র আত্মা হইতে যে নিবেদন আকাশের

দিকে উত্থিত হয়, اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين انعمت عليهم আয়াত দ্বয়ে উহার পূর্ণ নকশা অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে যুগোপযোগী কালাম নাযেল হইয়া থাকে। যেহেতু সুরা ফাতেহায় যুগ-মানবাত্মার ক্রন্দনকে অনুপম ভাষায় রূপায়িত করিয়া কুরআন করীম নাযেল করা হইয়াছে, এই জন্য সুরা ফাতেহাকে উম্মুল-কুরআন (কুরআনের মা) বা উম্মুল কেতাব (কেতাবের মা) বলা হইয়াছে। সুপথ লাভের জন্য মানবাত্মার সকাতর ডাক সুরা ফাতেহায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহারই ফলে কুরআন করীমের নযুল। তাই সুরা ফাতেহা উম্মুল কুরআন অর্থাৎ কুরআনের জননী। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যামানায় সারা বিশ্ব গুমরাহীতে ডুবিয়া গিয়াছিল। সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থধারী জাতি এ গুমরাহী দূর করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। এ হেন অসহায় অবস্থায় বিশ্ব-মানবাত্মা সুপথ পাওয়ার জন্য ক্রন্দন করিতেছিল এবং অতীতকালের গ্রন্থগুলিও মানবজাতিকে উদ্ধার করিতে অক্ষম হইয়া যেন আল্লাহ্তায়ালার নিকট সুরা ফাতেহার اهدنا الصراط المستقيم "সরল সহজ সঠিক পথে পরিচালিত কর" ভাষায় দোওয়া করিতেছিল। ইহারই ফলে কুরআন করীমের নযুল। তাই সুরা ফাতেহা উম্মুল কেতাব।

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় বর্ণনা করা জরুরী মনে করি। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পূর্বে কোন জাতিকে সুপথ পাইবার জন্য আল্লাহ্তায়ালা কোন দোওয়া শিখান নাই। অথচ একলক্ষ চব্বিশ হাজার বার এই দোয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। কিন্তু দোওয়া না শিখাইলেও আমরা দেখি যে অতীতে পথহারা হইয়া মানবত্মা যখনই পথের দিশার জন্য ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তখনই আল্লাহ্তায়ালার ফযল নামিয়াছে, নবীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং মানবজাতি পথের দিশা পাইয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনের পর যদি নবী আসা—অর্থাৎ হেদায়েত লাভের পথ বন্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সুরা ফাতেহা, যাহা কুরআনের মাতা, উহার মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা হেদায়েত চাওয়ার এমন অনুপম দোওয়া শিখাইলেন কেন? তবে কি মানুষ আর গুমরাহ্ হইবে না? সকল ধর্মে, কুরআন করীমে, হাদীসে এবং বুযুর্গানের ভবিষ্যদ্বাণীতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে যে, শেষ যুগে গুমরাহী বিশ্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী আকারে বিস্তার লাভ করিবে। কে এ গুমরাহী দূর করিবে? অতীতে ছোট ছোট গুমরাহী, এমন কি এক একটি বিশেষ পাপের প্রাদুর্ভাবের জন্য এক এক দেশে এক এক জাতির মধ্যে এক এক নবীর আবির্ভাব হইয়াছে। কারণ নবীর মারফতই গুমরাহী দূর হইয়া থাকে। পথের দিশা নবীই দিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় শেষ যুগে বিশ্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী গুমরাহীর ময়দান উন্মুক্ত থাকিয়া হেদায়েতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গেল, এ কেমন কথা? তদুপরি হেদায়েতের জন্য প্রতি নামাযে যুগে যুগে কোটি কোটি কণ্ঠে اهدنا الصراط المستقيم

صراط الذين انعمت عليهم আয়াতে প্রতি নিয়ত দোওয়া চাহিবার ব্যবস্থা দিয়া জরুরতের সময় খোদা চুপ করিয়া নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিবেন, একথা কল্পনা করা ও বলা কি যুক্তি ও বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাজ? যে চক্ষুষ্মান সে বুঝিবে যে, বিপদের আকার প্রকার যেরূপ ভয়ঙ্কর, দোওয়ার ভাষা ও ব্যবস্থাও সেইরূপ সুগভীর ও সুদৃঢ়, পূর্ণাঙ্গীন ও অবিচল হইয়া থাকে। অতীতে গুমরাহী দেখিয়া মানুষ দোওয়া করিয়াছে, উহার পূর্ব হইতে নহে। এখানে বিপদ আসার বহু পূর্ব হইতে অবিরাম ধারায় দোওয়ার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। সুতরাং এখন ও ভবিষ্যতে জরুরতের সময় দোওয়ার উপযোগী সুনিশ্চিত সুফল অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্-তায়ালার রহমতের দ্বার বন্ধ হয় নাই এবং হইবে না, হইতে পারে না।

নবুওতের নযুলের শর্তাবলী

নবুওতের নযুলের সম্বন্ধে পাঠক তিনটি শর্ত স্মরণ রাখিবেন। (১) যুগ—গুমরাহীর হওয়া চাই, (২) মানবজাতির অন্তর হইতে উদ্ধারের জন্য কাতর ডাক উঠা চাই এবং (৩) হেদায়েতের জন্য যুগের পবিত্রাত্মা পুরুষের আত্মবিলীন ও একনিষ্ঠ দোওয়া থাকা চাই। এই শেষোক্ত মহাপুরুষই নবুওতের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকেন। প্রথম দুই শর্ত পূর্ণ হইলে, জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সৎ, সাধু ও পবিত্র এবং একদিকে পরম মানব দরদী ও অপর দিকে ইলাহী প্রেমে বিভোর, তিনিই নবুওত প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক মনোনীত হন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ 'তিনি প্রত্যেককে তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী ফযল দিয়া থাকেন।" (সুরা হুদ-১ম রুকু)।

আল্লাহ্তায়ালা আপন অযাচিত অনুগ্রহে প্রত্যেক নবীর মারফৎ পরবর্তী যুগ ও নবীর সম্বন্ধে কতকগুলি সুনিশ্চিত লক্ষণ জানাইয়া থাকেন, যদ্বারা প্রত্যেক যুগেই বান্দাগণের জন্য হেদায়েত লাভ সহজ হয়। প্রত্যেক গুমরাহীর যুগে যতদিন পর্যন্ত ২নং শর্ত পূর্ণ হইবে, ততদিন জগতে নবীও আসিবেন এবং হেদায়েতও নাযেল হইবে। কিন্তু যখন মানবের মনে গুমরাহী হইতে বাঁচিবার জন্য ব্যাকুলতা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন তাহাদের মধ্যে পবিত্রাত্মাও জন্মিবে না এবং হেদায়েতও নাযেল হইবে না। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, ইসলামের বিশ্ব-জোড়া প্রাধান্য লাভের পর এক যুগ আসিবে, যখন এক মৃদু-মধুর বায়ু-হিল্লোলে সকল নেক বান্দা মরিয়া যাইবে এবং কেবল দুষ্টের দল থাকিয়া যাইবে। অতঃপর পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হইবে। (মুশ্লিম)। এই হাদিস হইতে বুঝা যায়, সেই যুগের দুষ্টের দলের কাহারও মনে اهدنا الصراط المستقيم আয়াতের

দূরবর্তী ভাবও বিরাজ করিবে না এবং তাহাদের মধ্যে হেদায়েত গ্রহণের কোন স্পৃহাও থাকিবে না। ফলে তাহাদের মধ্যে কোন পূণ্যাত্মাও থাকিবে না এবং হেদায়েতও নাযেল হইবে না। আল্লাহ্তায়ালা কাহারও স্কন্ধে হেদায়েত জবরদস্তি চাপাইয়া দেন না। সুতরাং তাহাদের স্বাভাবিক পরিণাম হইবে সর্বগ্রাসী ধ্বংস, যেভাবে সুরা বাকারার প্রথম রুকুর শেষাংশে এই প্রকারের কাফের, যাহারা চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয়কে আবৃত করিয়া রাখে, তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "এবং তাহাদের জন্য আছে সর্বগ্রাসী আযাব।"

এই প্রসঙ্গে বর্তমান যুগের একটি অনুরূপ ব্যাধির উল্লেখ করা প্রয়োজন।

যত মত তত পথ

বর্তমান যুগে ধর্মের নামে প্রচলিত এই একটি মতবাদ দেখা যায়। এই মতবাদ মানুষকে ধর্মকর্মে উদাসীন করিয়া পরিণামে তাহাকে ধর্মহীন করিয়া ফেলে। মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে বিলুপ্ত করার জন্য ইহা ক্লোরোফরম বিশেষ। সাধারণতঃ মানুষ ধর্ম বিষয়ে মতান্তরে যাইতে চাহে না। সে পুরাতনকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চায়। এমতাবস্থায় ধর্মীয় পোষাকে যদি এই মতবাদ প্রচার করা হয়, তাহা হইলে ইহার ফল ক্ষতিকর হইবে। যখন আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে যুগনবী আসিয়া আহ্বান জানাইবেন, তখন অনেকেই তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে এবং কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। যেহেতু নবী মানবজাতিকে আসন্ন বিপদ ও ধ্বংস হইতে বাঁচাইতে আসেন সেই জন্য তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন নিশ্চিত ধ্বংসকে ডাকিয়া আনার নামান্তর। পক্ষান্তরে এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা একটি অসার এবং ধ্বংসাত্মক মতবাদ।

অসার এই জন্য যে, এই মতবাদ অনুযায়ী চলিলে কি ফল হইবে তাহার উল্লেখ নাই। তবু খ্রীষ্টিয় ধর্মে যীশুর আত্ম-বলিদানে বিশ্বাসী হইয়া যাহা খুশী করিলেও স্বর্গ লাভের আশ্বাস দেওয়া হয়, কিন্তু এই মতবাদে ফলের কোন আশ্বাসও নাই। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, যে কোন মত ও পথে চলিলে খোদালাভ হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, নাস্তিকতাবাদে চলিলেও কি খোদালাভ হয়? যুগ নবী ও তাঁহার অনুগামীগণ ছাড়া কি কোন সময়ে বাকী দলের কাহারও নিকট খোদালাভের নিশ্চিত নিদর্শন থাকে ও আছে? এই মতবাদ যদি পার্থিব বা ধর্মীয় ব্যাপারে আমল করার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়,

তাহা হইলে কি এক দিনেই দুনিয়া বিপরীত অবস্থা ধারণ করিবে না, দেশ, জাতি ও ধর্মের ঘরে হানাহানি, মারামারি ও কাটাকাটি লাগিয়া মানব-মণ্ডলী ধ্বংস হইয়া যাইবে না? বস্তুতঃ নবীর তিরোধানের পর কালের গতিতে মানুষের অবাধ্যতাচরণ ও ধর্মহীনতার ফলে যখন নবুওতের আলো নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তখন বহু মত ও পথের অভিশাপ জাতি ও জনগণের মাথায় চাপিয়া জাহান্নামের সৃষ্টি করে। মানুষ তখন দিশাহারা হইয়া যায়, বাঁচিবার পথ পায় না। তাহাদের আত্মা ও অবস্থা তখন পথের জন্য ফরিয়াদ করিতে থাকে। তখন সব মত ও পথ বাদ দিয়া তাহাদের মাত্র একটি মত ও পথের প্রয়োজন হয়। ঈস্পীত সেই একটি পথ, পরম ঈস্পীত সেই এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতেই আসে। সব মানুষ যখন পথ হারায়, তখন এক আল্লাহ্ আমাদের জন্য এক পথ প্রদর্শক পাঠাইয়া এক পথ দেখান। সেই পথ ভ্রাতৃত্বের পথ, সেই পথ শান্তির পথ, সেই পথ প্রগতির পথ, সেই পথ খোদালাভের পথ। যাহারা যুগ পথ-প্রদর্শক নবীকে মানে, তাহারা বাঁচিয়া যায় এবং জয়যুক্ত হয় এবং যাহারা না মানে, তাহারা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আলোচ্য বাক্যের অসারতার আরও প্রমাণ এই যে, কোন ধর্মের অনুসারী বা মতবাদে বিশ্বাসী অপর ধর্ম বা মতবাদের সত্যতা স্বীকার করে না। তাহারা নিজ নিজ মত ও পথকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করে। যাহারা "যত মত তত পথ" মতবাদের প্রচার করে, তাহারা কোন-ধর্মে বিশ্বাসী নহে এবং কোন ধর্মের নির্দিষ্ট আচার পালন করে না এবং ধর্মের আচার পালনের ফল সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ। যদি তাহাদের কেহ ধর্ম বা মতবাদ সমূহের একটির পর একটির ধারাবাহিক অনুশীলন করিয়া প্রত্যেকটির দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার সান্নিধ্যের নিশ্চিত ফল প্রাপ্ত হইয়া জগতের নিকট প্রত্যেক ধর্ম ও মতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করিত, তাহা হইলে তাহাদের "যত মত তত পথ" প্রচার করার অধিকার ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তাহাদিগের তহবীল শূন্য। যাহারা যত মতের ও পথের ওকালতি করেন, ঐগুলির কোনটির সম্বন্ধেও তাহাদের ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নাই এবং বিভিন্ন মত ও পথচারীগণ পরস্পর কেহ কাহাকেও সত্য পথচারী বলিয়া স্বীকার করে না। এই ভাবে প্রত্যেক মতবাদের বিরুদ্ধে বাকী সকল মতবাদীর স্বাক্ষর রহিয়াছে। এমতাবস্থায় সকল মত ও পথ কাহাদের বা কাহার স্বাক্ষরে সত্য হইবে? আল্লাহ্তায়ালারও স্বাক্ষর তাহাদের কাহারও সঙ্গে নাই। সুতরাং তাহাদের বুলি অন্তঃসারশূন্য।

পক্ষান্তরে যত নবী আসেন তাঁহারা মানুষকে আল্লাহ্তায়ালার প্রেমের নিশ্চিত সন্ধান ও জ্বলন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করাইয়া দৃঢ় প্রত্যয়ের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ-ও হয়, তা-ও হয়, সে-ও হয়, অথচ কিছুই হয় না, এরূপ শিক্ষা তাহারা আনেন না। বস্তুতঃ ইসলাম একমাত্র সত্য

ধর্ম এবং ইহার শিক্ষা মানুষকে একমাত্র সিরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত করে। এই পথে কেহ কখনও অকৃতকার্য হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না।

বর্তমান যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) গণনাতীত অকাট্য প্রমাণ ও নিদর্শন সহ এই ঘোষণাই করিয়াছেন যে, "আমি মানুষকে চিরঞ্জীব খোদার নিশ্চিত সন্ধান ও নৈকট্যে পৌঁছাইতে আসিয়াছি। সেই ঢোলক কোথায়, যাহাতে আঘাত করিয়া আমি জগদ্বাসীকে সেই অমূল্য সম্পদের সন্ধান দিব"।

"যত মত তত পথ" মতবাদের খণ্ডন করিতে আল্লাহ্তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উপর ইলহাম করিয়াছিলেন, يحى الدين ويقيم الشريعة "তিনি দ্বীনকে জিন্দা করিবেন ও শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।" দ্বীন হইল ইসলামী মতবাদ এবং শরীয়ত হইল ইসলামী পথ। তিনি সকল মতবাদ ও পথের তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা ও অকাট্য প্রমাণাবলী ও নিদর্শন সমূহের দ্বারা ইসলামী মতবাদ ও ইসলামী পথকে সকলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা এ কার্য সম্পাদিত করার প্রতিশ্রুতি কুরআন করীমে ছিল এবং তিনি তাহা পূর্ণ করিয়াছেন।

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ -

"সে তিনি (আল্লাহ্), যিনি তাঁহার রসুলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন, যেন সে উহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিতে পারে।" (সুরা—আস-সাফ ১ম রুকু)। সুতরাং একমাত্র সত্য ধর্ম ইসলামের বাহিরে কোন মত ও পথ নাই। ইহা সেরাতে মুস্তাকীম এবং নে'মতের পথ। বাকী যত মত ও পথ, ধ্বংসের পথ।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) দুনিয়া ধ্বংসের যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, যাহার আলোচনা আমরা উপরে করিয়া আসিয়াছি, উহার বীজ "যত মত তত পথ" মতবাদে নিহিত দেখা যায়। এখন اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم দোওয়া পাঠের গুরুত্ব কত প্রয়োজনীয় তাহা জাজ্বল্যমান।

সুরা ফাতেহা কুরআন করীমের অংশ

হযরত রসুল করীম (সাঃ) সুরা ফাতেহাকে কুরআনে-আযীম বলিয়াছেন। ইহার এ অর্থ নহে যে, বাকি কুরআনকে তিনি ছোট বলিয়াছেন। যেহেতু তিনি ইহাকে উম্মুল কুরআন এবং উম্মুল কেতাব বলিয়াছেন, সেই জন্য কাহারও ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইতে পারে যে,

সুরা ফাতেহা কুরআন হইতে পৃথক। সেই জন্য তিনি ইহাকে কুরআনে-আযীম বলিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন যে, ইহা কুরআনের অংশ। আমরা যে কোন জিনিসের অংশকেও ঐ জিনিসের নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যেমন আম বলিলে অনেকগুলি আমকেও আমরা আম বলি, আবার একটি বা উহার একটি ফালিকেও আম বলিয়া থাকি। তেমনি কুরআনে আযীম বলিলে কুরআনের অংশকেও বুঝাইবে। যখন কেহ এক আয়াতও কুরআন পড়ে, তখন ঐ আয়াতকেও আমরা কুরআন বলি। যখন হাওয়ালা দিতে আমরা কুরআনের একটি আয়াতও পড়ি, আমরা বলি যে, কুরআনে-পাক এইরূপ বলিতেছে। ইহার অর্থ কেহ ইহা করে না যে, সারা কুরআন পড়িয়া দিয়াছি। উহাকে আমরা কুরআন বলিলেও কুরআনের অংশ বলিয়া বুঝিয়া থাকি।

মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম তত্ত্বের উদঘাটন

উপরে আলোচিত সুরা ফাতেহার তিনটি নাম, যথা—কুরআনুল-আযীম, উম্মুল-কেতাব ও উম্মুল-কুরআনের মধ্যে এক রুহানী-তত্ত্ব নিহিত আছে। ইহাকে কুরআনের মা বলা হইয়াছে এবং কুরআনও বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মা এবং সন্তান উভয়ই বলা হইয়াছে। বস্তু জগতে এরূপ হয় না, কিন্তু রুহানী জগতে এরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রথম অবস্থা রূপান্তরিত হইয়া দ্বিতীয় অবস্থায় পরিণত হয়। ইহাতে প্রথম অবস্থা মাতৃ-সদৃশ এবং দ্বিতীয় অবস্থা সন্তান বা পুত্র-সদৃশ হয়। যেমন সুরা তাহরীমের শেষাংশে এমরানের মেয়ে মরিয়মের সহিত মোমেনের তুলনা করা হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ -

অর্থাৎ "এবং মরিয়ম, এমরানের মেয়ে, যে স্বীয় সতীত্বকে সংরক্ষিত করিয়াছিল, আমরা তাহার (তাহার সদৃশ পুরুষের) মধ্যে আপন কালাম ফুঁকিয়া দিলাম এবং সে স্বীয় রবের কালাম এবং গ্রন্থাবলীর উপর ঈমান আনিল এবং পরিণামে সে (মরিয়মরূপী পুরুষ) ফরমাবরদার পুরুষ হইয়া গেল" (সুরা তাহরীম ২য় রুকু)। অর্থাৎ যাহারা মরিয়মী গুণধারী পুরুষ (অর্থাৎ সিদ্দীক), তাহারা যখন উন্নতি করিতে করিতে কালামে ইলাহীর দ্বারা ভূষিত হয়, তখন তাহারা মসীহী পুরুষ হইয়া যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, মরিয়ম আল্লাহর কালাম লাভের ফলে ইবনে মরীয়ম, অর্থাৎ একজন সিদ্দীক কালামে-ইলাহী দ্বারা ভূষিত হইলে ঈসা-সদৃশ

নবী হয়। এখানে কালামে ইলাহীর নযুলে একই ব্যক্তির রুহানী রূপান্তরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর ক্ষেত্রে এইরূপ আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটিয়াছিল। ওহী প্রাপ্তির ফলে তিনি সিদ্দীকীয়তের মোকাম হইতে নবুওতের মোকাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বিষয়কেই রূপক ভাষায় বলা হইয়াছে যে, তিনি প্রথম মরিয়ম-সদৃশ ছিলেন এবং পরে তিনি ইবনে মরিয়ম হন।

সুতরাং সুরা ফাতেহার উপরোক্ত তিনটি নাম ইসলামী পরিভাষার উপর এক সূক্ষ্ম আলোকপাত করিয়াছে যে, কিভাবে মা সন্তানে পরিণত হয়। যাহারা এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, তাহাদের বুঝিবার জন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ) সুরা ফাতেহাকে কুরআনের মা-ও বলিয়াছেন এবং স্বয়ং কুরআনও বলিয়াছেন। এখন একজন সাচ্চা মুসলমানের জন্য এ কথা বুঝা কঠিন নহে যে, আল্লাহ্তায়ালা কিভাবে একই ব্যক্তিকে মরিয়মও বলিয়াছেন এবং ইবনে মরিয়ম বা ঈসাও বলিয়াছেন। যখন তিনি বর্তমান গ্লানিভরা জগতে এক মসীহের আবির্ভাবের জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট আকুল নিবেদন জানাইতেছিলেন, তখন তিনি মরিয়মী (সিদ্দীকীয়তের) মোকামে খাড়া ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাকে মরিয়ম আখ্যা দেওয়া হয়, যেভাবে اهدنا الصراط المستقيم এর দোওয়ার জন্য, যাহা এক হেদায়েতনামা চাহিতেছিল, সুরা ফাতেহাকে উম্মুল-কুরআন বা উম্মুল-কেতাব বলা হইয়াছে। কিন্তু যখন আল্লাহ্তায়ালা সেই মহাপুরুষের দোওয়া শুনিলেন এবং তাঁহাকে দুনিয়ার জন্য মসীহ্-রূপে আবির্ভূত করিলেন, তখন তাঁহাকে তিনি ঈসা নামে আখ্যায়িত করিলেন, যেমন اهدنا الصراط المستقيم এর ধ্বনি উচ্চনাদে উঠিয়া কুরআন করীমকে আনয়ণ করিয়া এবং এই দোওয়া স্বয়ং উহার মধ্যে সংযুক্ত হইয়া কুরআনে আযীম নামে অভিহিত হইতে লাগিল।

মুসলমান জাতির জন্য সবক

এই দোওয়ার মধ্যে আর এক মহান সবক রহিয়াছে, যাহা সাহাবা (রাঃ আঃ) গ্রহণ করিয়া জগতে এক মহান নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত জগতে আর কোন জাতির মধ্যে নাই। পরবর্তীকালের মুসলমানেরা যদি সেই সবক স্মরণে রাখিত, তাহা হইলে তাহারাও অনুরূপ উচ্চাদর্শ রাখিয়া যাইতে পারিত, এবং আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাহারা স্খলিত হইয়া পড়িত না। আজও যদি মুসলমানগণ সেই হেদায়েতর উপর লক্ষ্য-স্থির করিয়া ফেলে, তাহা হইলে অচিরাৎ তাহাদের সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে এবং আবার তাহারা দৃষ্টান্ত-বিহীন বিপুল সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইতে পারিবে।

মুসলমান জাতির লক্ষ্য মোকামে মাহ্‌মুদ

যে সবক এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে উহা এই যে, প্রত্যেক জাতির এক লক্ষ্য থাকে এবং তাহারা উহা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। দুনিয়াকে সৃষ্টি করার এক উদ্দেশ্য আছে। যে জাতি উহা পূর্ণ করে, সেই জাতিকেই জগতের সৃষ্টির লক্ষ্যস্থল বলা হয়। হযরত আদম (আঃ) আসিয়া তৎকালীন দুনিয়াকে কতকগুলি সুশিক্ষা দেন, যাহা তখনকার জন্য উচ্চাঙ্গের শিক্ষা ছিল। সেই শিক্ষা পালন করিয়া সেই যামানার লোক অনেক রুহানী ও নৈতিক উন্নতি করিয়াছিল এবং তাহারা বুদ্ধিতে পূর্ববর্তীগণকে বহুল পরিমাণে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিশ্ব-মানবতার জন্য যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে, তাহারা সে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিল না, জাগতিক উন্নতির বিষয়ে তাহারা অনুসন্ধানে রত হইল। তখন হযরত নূহ (আঃ) আসিয়া মানবজাতিকে উন্নতির আরও এক ধাপ উর্ধে লইয়া গেলেন। ফলে তাহারা রুহানী, আখলাকী এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহারাও সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হইল না। তখন এইভাবে একের পর এক নবী আসিয়া তাহাদিগকে ক্রমেই লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া লইয়া যাইতে থাকে। এই ধারা চলিতে চলিতে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব হইল। এ যাবৎ যে সকল রহস্য ও তত্ত্ব গোপন ছিল, তিনি আসিয়া সে সব প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং রুহানী ও জাগতিক এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জরুরী সকল বিষয় তিনি বর্ণনা করিলেন। তিনি জ্ঞানের ভিত্তিতে ধর্মকে পূর্ণতা দিলেন এবং এলান করিলেন اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ

অর্থাৎ "আজ তোমাদের জন্য ধর্মকে পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে পূর্ণ করিয়া দিলাম।" (সুরা মায়েদা—১ম রুকু)। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁহার মহান শিক্ষাকে কার্যতঃ বিশ্বব্যাপী পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রেরিতত্ব পূর্ণভাবে সফল হয় না।

আল্লাহ্‌তায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টির মাঝে সমষ্টিগত ভাবে এক মহান মর্যাদাশীল মণ্ডলী হিসাবে কাজ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মানুষ প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে উন্নতি করিবে তাহাই নহে, বরং সমস্ত মানবজাতি সম্মিলিতভাবে উন্নতিশীল হইবে, ইহাই ছিল তাহাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার চতুর্থ রুকুতে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন যে, যখন আদম (আঃ)-কে খেলাফত দেওয়া হইল, তখন ফেরেশ্তাগণ নিবেদন করিয়াছিল যে, মানবজাতিকে কেন এভাবে অনুগৃহীত করা হইল। তাহারা-তো ইহার মর্যাদা রক্ষা করিবে না। তাহারা দুর্নীতি, ব্যভিচার, বিবাদ বিসম্বাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত করিবে। এই ভাবে ফেরেশ্তাগণ মানব জাতিকে এক অপ্রশংসার সৃষ্টি হিসাবে এবং তাহারা আল্লাহ্তায়ালার মহিমার কারণ না হইয়া অপ্রশংসার কারণ হইবে বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। ফেরেশ্তারা ভাবিয়াছিল আল্লাহ্তায়ালার গুণগান ও মহিমা কীর্তন ও তাঁহার গুণাবলী প্রকাশের জন্য তাহারাই যথেষ্ট। ফেরেশ্তাগণ মানব চরিত্র ও তাহাদের বিভিন্নমুখী বিচিত্র কার্যকলাপ অবলোকন করিয়া তাহাদের সৃষ্টিকে অর্থহীন মনে করিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল মানুষ বিদ্রোহী হইবে এবং তাহাদের দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা-গীতি এবং গুণের প্রকাশ হইবে না। ইহার জন্য তাহারা নিজদিগকেই চরম ও পরম বলিয়া মনে করিয়াছিল। "আমি যাহা জানি, তোমরা তাহা জান না" বলিয়া আল্লাহ্তায়ালা আদম ও ফেরেশ্তাগণের এক সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ফেরেশ্তাগণ ও আদমের সমক্ষে কতকগুলি বিষয় রাখিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই পরীক্ষায় ফেরেশ্তাগণ অকৃতকার্য হইয়া স্বীকার করিল, "(তুমি মানবকে খেলাফত দিয়া এক অপ্রশংসার সৃষ্টি করিয়াছ বলিয়া আমরা যে ধারণা করিয়াছিলাম, উহা ভুল), তুমি (এই এলযাম হইতে) পবিত্র। আমাদিগকে তুমি যে জ্ঞান দিয়াছ, তাহার অতিরিক্ত আমরা কিছুই জানি না।" (সুরা বাকারা—৪র্থ রুকু)। ইহাতে আল্লাহ্-তায়ালা মন্তব্য করেন, "আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আসমান সমূহ এবং যমীনের রহস্য-সমূহ আমি জানি, এবং আমি জানি তোমরা যাহা প্রকাশ কর এবং যাহা গোপন কর (অর্থাৎ যাহা প্রকাশ করিতে পার না)" —(ঐ)। এতদ্বারা আল্লাহ্তায়ালা জানাইয়াছেন যে, ফেরেশ্তাগণের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। এক এক ফেরেশ্তা এবং এক এক জাতীয় ফেরেশ্তা আল্লাহ্তায়ালার মাত্র এক এক গুণের প্রকাশ করিতে পারে। ইহার অধিক তাহাদের ক্ষমতা নাই। যেমন রহমের ফেরেশ্তা গযব করিতে পারে না এবং গযবের ফেরেশ্তা রহম করিতে পারে না। পক্ষান্তরে মানব ব্যক্তিগতভাবে যেমন একাধারে আল্লাহ্তায়ালার বিভিন্ন গুণাবলীর প্রকাশ করিতে পারে, তেমনি সম্মিলিত ভাবেও সমগ্র মানবজাতি ইহা করিতে পারে। আসমান যমীনে তাহারা তাঁহার গুণাবলীর বিকাশ করিবে। তাহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক রহস্যাবলীর অপূর্ব উদ্ঘাটন হইবে। এতদুদ্দেশ্যেই খেলাফতের প্রতিষ্ঠা করা হইল এবং খেলাফতের মাধ্যমেই ইহা সংঘটিত হইবে। ফেরেশ্তাগণ যাহাদিগকে অপ্রশংসার পাত্র এবং অপ্রশংসার কারণ মনে করিতেছিল, তাহারা আল্লাহ্তায়ালার অপূর্ব

প্রশংসাকারী এবং নিজেরাও প্রশংসা-ভাজন হইবে এবং তাহাদের সৃষ্টির সার্থকতাকে সাব্যস্ত করিবে। এই লক্ষ্যকে কুরআন করীমে মোকামে মাহমুদ বলিয়াছে। হযরত আদম (আঃ) হইতে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী তাঁহাদের উম্মতকে এই লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা সুরা আন-আমে দশম রুকুতে হযরত নূহ (আঃ) (প্রথম শরীয়তধারী নবী) হইতে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ "আমরা তাহাদিগকে সেরাতে মুস্তাকীমের দিকে পথ দেখাইয়াছি।" পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ "নিশ্চয়ই তুমি নবীগণের মধ্য হইতে, সিরাতে মুস্তাকীমে অধিষ্ঠিত।" (সুরা ইয়াসীন-১ম রুকু)। উপরোক্ত দুইটি আয়াতে প্রনিধানযোগ্য বিষয় হইল পূর্ববর্তী সকল নবী সিরাতে মুস্তাকীমের উদ্দেশ্যে অভিযাত্রা করিয়াছিলেন এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সিরাতে মুস্তাকীমে অধিষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সকল নবী যুগ, পরিবেশ ও প্রয়োজন-উপযোগী আংশিক শিক্ষা আনিয়াছিলেন এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) পূর্ণ শিক্ষা ও পূর্ণ আদর্শ দিয়াছেন। মানব জাতির মধ্যে তিনিই ব্যক্তিগতভাবে প্রথম মোকামে মাহমুদ লাভ করেন এবং তাঁহার সাহাবা (রাঃ আঃ) মণ্ডলী হিসাবে প্রথম মোকামে মাহমুদ লাভ করেন। এই মর্যাদা ইসলামে নির্ধারিত সময়ের নামায ছাড়া তাহাজ্জুদের নামায দ্বারা হাসিল হয়। কুরআন করীমে আল্লাহ্তায়ালা বলেন:

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

"নামাযকে কায়েম কর সূর্য ঢলিবার সময় হইতে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত (নির্ধারিত চারিবারের নামায) এবং প্রভাতে কুরআন (ফজরের নামাযে উচ্চস্বরে পাঠ কর)। নিশ্চয় প্রভাতের কুরআন (পাঠ) বড়ই পছন্দনীয় এবং রাত্রের শেষার্ধে তোমার

কল্যাণার্থে নফল নামাযের জন্য শয্যাত্যাগ কর। ইহা তোমাকে মোকামে-মাহমুদে পৌঁছাইবে।" (বনি ইসরাইল- ৯ম রুকু)। হযরত রসুল করীম (সাঃ) মহা-কল্যাণকর মোকামে-মাহমুদের বাণী ও আদর্শ লইয়া একা দণ্ডায়মান হন এবং সারা জগত তাঁহার বিরুদ্ধাবাদী ও দুশমন হইয়া যায় এবং তাঁহাকে মন্দ বলিতে ও কষ্ট দিতে থাকে। তাঁহার বিরুদ্ধে এত দুর্ণাম করা হয় এবং তাঁহাকে এত গালি দেওয়া হয় যে, দুনিয়ায় এত দুর্ণাম জগতের নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সম্বন্ধেও করা হয় নাই এবং এত গালিও দেওয়া হয় নাই। বরং সারা জগতের সকল দুষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যত দুর্ণাম ও গালি আছে, সে-সবকে একত্র করিলেও, বিশ্বের মহা কল্যাণকামী হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যত দুর্ণাম ও গালি দেওয়া হইয়াছে, তাহার সমান হইবে না। তাঁহার যুগের ব্যক্তিদের এবং অপরাপর ধর্মানুসারীদের কথা বাদ দিয়া একা খ্রীষ্টান-জগত হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যে বিষ উদ্‌গার করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছে সেই পুস্তকসমূহকে পর পর সাজাইয়া গেলে কয়েক মাইল লম্বা হইবে এবং উহাদিগকে একের উপর আর এক করিয়া সাজাইলে উচ্চ পাহাড় হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে তাঁহাকে জীবদ্দশায় এত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে যে, এত কষ্ট দুনিয়ার কোন মহা যালেম ও পাপীকেও দেওয়া হয় নাই। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম সত্য হইল। তাঁহার আত্মবিলীনকারী দোওয়ার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহা পরিবর্তন দেখা দিতে লাগিল। বাতাস ঘুরিয়া গেল। দুর্ণাম ও গালি—প্রশংসায়, কষ্টদান—অকৃত্রিম খেদমতে এবং হিংসা—অপূর্ব প্রেমে পরিবর্তিত হইয়া গেল। যাহারা তাঁহার জীবন লইবার জন্য পাগল ছিল, তাহারা তাঁহার জন্য নিজ নিজ জীবন দানে প্রতিযোগীতা করিতে লাগিল। শুধু ইহাই নহে বরং পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত ও পরস্পরের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ ও দ্বন্দ্বে-লিপ্ত সারা আরব তাঁহার দোওয়া ও মহান আদর্শে যাদুমন্ত্রের ন্যায় অপূর্ব ভ্রাতৃপ্রেমে শীসাগলিত প্রাচীরের ন্যায় এক আত্মা হইয়া গেল। ইহার ফলে দুনিয়ার ইতিহাসে তাহারা মণ্ডলী হিসাবে স্বয়ং প্রশংসার পাত্র এবং তাহাদের সৃষ্টি মানবজাতির জন্য গৌরব ও আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য প্রশংসার কারণ হইয়া রহিয়াছে। সারা বিশ্বকে এই পরম লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো মুসলমানদের কাজ ছিল, কিন্তু তাহারা কিছু কাল পর কর্তব্য ভুলিয়া অধঃপতিত হইল। তাহারা জগতের গুরু ছিল। সুতরাং তাহাদের অধঃপতনের সহিত সারা বিশ্ব-মানব পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে সকলে পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া গেল। দুনিয়া জাহান্নামে পরিণত হইল। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে দুর্ণাম আবার সোচ্চার হইয়া উঠিল। বিজাতীয়গণ অপ-প্রচারণার দ্বারা এবং অনুগামীগণ বিরুদ্ধ আমলের দ্বারা তাঁহাদের

উদ্ধারকর্তাকে অপ্রশংসার পাত্রে এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথকে অবাঞ্ছিত ও অবহেলিত পথে পরিণত করিয়াছে। যিনি মহা প্রশংসার পাত্র তাঁহাকে মোকামে মাহমুদ হইতে নামাইবার প্রচেষ্টায় সকলে মিলিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে মসী-লেপন করিতে যাইয়া তাহারা স্বয়ং মসীলিপ্ত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। যে সূর্য্য তাহাদিগকে আলোকিত করিয়াছিল, উহাকে অন্ধকার আবরণে ঢকিয়া দিতে গিয়া তাহারা নিজেরাই অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ছিলেন إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ "এবং নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (সুরা কলম—২য় রুকু)।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রসুল (হযরত মোহাম্মদ সাঃ)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ রহিয়াছে।" (সুরা আহযাব-৩য় রুকু)।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে উপরে স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা যেরূপ চরিত্র মাধুর্য ও আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে এরূপ অপর কোন নবী সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বা কোন ইলাহীগ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। ঐতিহাসিক প্রমাণেও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে এ বিষয়ে সকল নবীর উর্ধে দেখা যায়। তাঁহার পূর্ববর্তী নবীগণ এক দুই বা কয়েকটি গুণের আদর্শ আনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মানব চরিত্রের সকল গুণের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন। এই জন্য তিনি প্রশংসার অধিকারী এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিয়ন্ত্রনে তাঁহার নাম হইয়াছে মোহাম্মাদ বা প্রশংসিত। সকল ভালোর যিনি অধিকারী, যাহারা তাঁহার অনুগমন করিবে, যুক্তিযুক্ত ভাবে তাহারা ভালো হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা এই জন্যই বলিয়াছেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ -

"বল: যদি তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভালবাস, তাহা হইলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।" (সুরা এমরান—৪র্থ রুকু)।

যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র, এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) সকল ভালোর সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ, সেই জন্য যে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুসরণ করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে ভালবাসেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) ছিলেন জীবন্ত কুরআন। সুতরাং ইসলামের গ্রন্থ কুরআন করীমকে যে গ্রহণ করিবে না, সে আল্লাহ্‌তায়ালার কর্তৃক গৃহীত হইবে না। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ - وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

"এবং যে কেহ ইসলামকে বাদ দিয়া অপর ধর্ম চাহিবে, উহা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না এবং পরবর্তীকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" (সুরা এমরান—৯ম রুকু)।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ۔ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۔

"যাহারা (ইসলামকে) অস্বীকার করিয়াছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা যায়, তাহাদের কেহ মুক্তিপণ স্বরূপ পৃথিবী বোঝাই স্বর্ণ দিলেও, উহা তাহার নিকট হইতে গৃহীত হইবে না। (সুরা—এমরান ৯ম রুকু)। এই সব আয়াতের সার কথা এই যে — ইসলাম, পবিত্র কুরআন এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরোধী কোন মত ও পথ মানবকে আল্লাহ্তায়ালার দিকে বা মঙ্গলের দিকে লইয়া যায় না এবং সেই জন্য ঐ সকল আল্লাহ্তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। ইসলামের কোন বিধি মানিয়া অদ্যাবধি কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু এখন ইসলাম ছাড়া সব মত ও সব পথ মানবকে গুমরাহীর দিকে ও ক্ষতির দিকে লইয়া যায়। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট কথা যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ ভালোকে মন্দ জ্ঞান করে, সে উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে এবং এরূপ বিরুদ্ধাচরণের ফলে সে মন্দ হইতে বাধ্য। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার দ্বারা গৃহীত হয় না। তাই জগত আজ ইসলামের বিপরীতে গিয়া অধঃপতিত হইয়া আল্লাহ্তায়ালার রোষে পড়িয়াছে।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনে এবং তাঁহার অনুগমনে মানব মণ্ডলী মোকামে মাহমুদের দিকে দ্রুত আগাইয়া চলিতেছিল, কিন্তু তাহাদের কর্মদোষে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছা আজ সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু এরূপ অবস্থা থাকিবে না। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন,

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۔

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

"তাহারা আল্লাহ্র আলোকে মুখের ফুৎকারে নিভাইয়া দিতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার আলোকে পূর্ণ করিবেন, যতই না কাফেরগণ ইহা অপছন্দ করুক। সে তিনি (আল্লাহ্), যিনি তাঁহার রসুলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন সে উহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিতে পারে, যদিও মুশরেকগণ ইহা অপছন্দ

করে।" (সুরা আস-সাফ-১ম রুকু)। এই আয়াতদ্বয় দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে, কাফের এবং মুশরেকগণ না চাহিলেও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা জয়যুক্ত হইবে। এই বিজয় সকল বুযুর্গান এবং কুরআনের তফসীরকারকের মতে বর্তমান যুগে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর দ্বারা সাধিত হইবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর দ্বারা এ কাজ সাধিত করিয়াছেন। তাঁহার নাম আহ্মদ অর্থাৎ প্রশংসাকারী। সত্যই তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এত প্রশংসা করিয়াছেন যে, ইহা আজ পর্যন্ত কেহ পারে নাই এবং তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপ্রশংসার স্রোতকে প্রশংসার দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-কে আবির্ভূত করিয়া ও তাঁহার দ্বারা আহ্মদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত করিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম ও তাঁহার প্রশংসার মহা বন্যা পুনঃ-প্রবাহিত করিয়াছেন এবং তাঁহার অনিন্দ-সুন্দর চরিত্র ও আদর্শকে পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি পবিত্র কুরআন ও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রদীপ্ত শিক্ষা ও আদর্শের সমুজ্জল আলোকে সকল ধর্মের বিচার করিয়া সত্য মিথ্যার উদঘাটন করিয়া দিয়াছেন এবং অকাট্যভাবে ইসলামের পূর্ণতা ও প্রাধান্য এবং আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিবার জন্য আজ ইহাই যে একমাত্র সজীব ধর্ম তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর ১১৪১৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত ৮৮ খানা পুস্তক, ৪৫৩৯ পৃষ্ঠায় ১০ খণ্ডে প্রকাশিত অমৃতবাণী, ৯০০০০ নব্বই হাজার লিখিত পত্রাবলী, সারা জীবন-ব্যাপী বক্তৃতা, মোবাহেসা, মোবাহেলা ইত্যাদি ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। আল্লাহ্তায়ালা চাহিয়াছেন, এ যুগে এই জামাত হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুগমনে তাহাদের একনিষ্ঠতা, পবিত্র আদর্শ, কুরবানী ও আত্মবিলীনকারী দোওয়ার দ্বারা সমগ্র মানবমণ্ডলীকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাইবে। একদিন হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)-এর রুহানী-স্পর্শে সারা আরব যেরূপ প্রশংসার মোকামে মাহমুদে পৌঁছিয়াছিল, এ যুগে আহ্মদীয়া জামাতের রুহানী প্রচেষ্টার দ্বারা বিশ্ব-মানব সেই মোকামে মাহমুদে পৌঁছিবে এবং ফেরেশ্তাগণের আপত্তিকে কার্যকরী ভাবে খণ্ডন করিবে। এ কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। আগামী ২০০ বৎসরের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত মানবমণ্ডলীকে তাঁহার পরিকল্পিত মোকামে-মাহমুদে উন্নীত করিবেন। নবীগণ ইহাকে আসমানী বাদশাহাত বলিয়াছেন, হিন্দুধর্মে ইহাকে সত্যযুগ বলিয়াছে এবং ইসলামী পরিভাষায় ইহাকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বর্গরাজ্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

পাঠক! এ কথা মনে করিবেন না যে মোকামে মাহমুদে পৌঁছিয়া মানুষের উন্নতি বন্ধ হইয়া যাইবে। বরং তখনই মানবমণ্ডলী সমষ্টিগত ও সম্মিলিতভাবে জাগতিক ও

আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার প্রকৃত পরিবেশ ও সুযোগ লাভ করিবে। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মোকামে মাহমুদ লাভ বলিতে, তিনি এক সীমা-রেখায় গিয়া থামিয়া গিয়াছেন বুঝাইবে না। তাঁহার জন্য মোকামে মাহমুদের অগণিত স্তর সমূহ রহিয়াছে। মদিনালাভ তাঁহার প্রথম মোকামে মাহমুদে পদার্পন, দ্বিতীয় — মক্কাবিজয়, তৃতীয় — পারস্য ও রোম-রাজ্যবিজয় ইত্যাদি। এমনকি এক এক ব্যক্তির হেদায়েতপ্রাপ্তিও তাঁহার জন্য মোকামে মাহমুদের রাজ্যে অগ্রগতি। যত নূতন নূতন মানুষ ইসলামে শামিল হইবে, তত বেশী তাহার গুণগানের পরিমাণ বাড়িবে। আল্লাহ্তায়ালা কুরআন পাকে বলিয়াছেন, وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى "তোমার জন্য পরবর্তীকাল পূর্ববর্তীকাল হইতে শ্রেয়।" (সুরা দোহা)। বস্তুতঃ প্রত্যেক দ্বিতীয় মুহূর্ত তাঁহার জন্য প্রথম মুহূর্ত হইতে শ্রেয়। অচিরেই আল্লাহ্তায়ালা সারা বিশ্বকে তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের ছায়াতলে আনিয়া তাঁহার প্রতি দরূদ পাঠের দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে সকল দুর্নাম ও গালিমন্দকে ভাসাইয়া তলাইয়া দিয়া, তাঁহাকে এক বিশ্ব-মোকামে-মাহমুদে পৌঁছাইবেন এবং বিশ্ব মানব-মণ্ডলীও তাঁহার অনুগমনে মোকামে মাহমুদে পৌঁছিবে। পরলোকেও হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং তাঁহার অনুগামীগণের জন্য মোকামে মাহমুদের পর্যায়ে ক্রমঃ-উন্নতি অব্যাহত থাকিবে।

এখানে আর একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। আমরা যে মোকামে মাহমুদের বা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর স্বর্গ-রাজ্য জগতে কায়েম হওয়ার আলোচনা করিলাম, সে সম্বন্ধে অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একমাত্র খৃষ্টানদের এক জোরদার ধারণা ও প্রচার আছে যে, ঐ রাজ্য পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং এই ধারণার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

আলোচ্য 'প্রশংসিত রাজ্য' যে হযরত ঈসা (আঃ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে না, সে কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই রাজ্য অন্যদের দেওয়া হইবে। "যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি কখনও শাস্ত্রে পাঠ কর নাই, গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল ; ইহা প্রভু হইতে হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত"। (সোলেমান নবীর গীত—১১৮ : ২২-২৩)। "এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদিগের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে তাহার ফল দিবে। আর এই প্রস্তরের উপর যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে ; কিন্তু এই প্রস্তর যাহার উপর পড়িবে তাহাকে চুরমার করিয়া ফেলিবে।" (মথি—২১ : ৪২-৪৪)। উপরে লিখিত উদ্ধৃতিতে কোণের প্রস্তর হইল হযরত

মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং ফল হইল তাঁহার অনুগামীগণের মধ্যে তাঁহার চির সজীব ও প্রবাহমান রুহানীয়তের ধারা। সুতরাং এতদ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের গৃহ হইতে সকল আসমানী কল্যাণ তাঁহার গৃহে চলিয়া যাইবে। খ্রীষ্টানগণ বর্তমান যুগে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, শেষ (অর্থাৎ বর্তমান) যুগের যীশু বনি ইসরাইলী না হইয়া তাঁহার সদৃশ হইবেন। "আমি রাত্রি-কালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন, তিনি সেই অনেকদিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন। আর তাঁহাকে কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল ; লোকবৃন্দ জাতি ও ভাববাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে ; তাঁহার কর্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না।" (দানীয়েল ৭ : ১৩)। "আর আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, শুভ্রবর্ণ একখানি মেঘ, সেই মেঘের উপরে মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন, তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ মুকুট ও তাঁহার হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ কাস্তা।" (যোহানের প্রকাশিত বাক্য ১৪ : ১৪) খ্রীষ্টানগণ যীশুকে মনুষ্যপুত্র বলিয়া থাকে। উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে 'মনুষ্যপুত্রের ন্যায়' বলিতে ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ এক মহাপুরুষকে বুঝাইতেছে, পূর্ববর্তী উদ্ধৃতিগুলি অনুযায়ী হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতে যাহার আবির্ভূত হওয়া নির্ধারিত হইয়াছিল।

বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ) বনি ইসরাইলী বিধান লইয়া আসিবেন না, বরং তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক পিতা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিধান লইয়া আসিবেন। "আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি আমি এই দ্রাক্ষাফলের রস আর কখনও পান করিব না সেই দিন পর্যন্ত, যখন আমি আপন পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে ইহা নূতন পান করিব।" (মথি - ২৬ : ২৯)। "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যেদিন আমি ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা নূতন পান করিব, সেই দিন পর্যন্ত আমি দ্রাক্ষা-ফলের রস আর কখনও পান করিব না।" (মার্ক - ১৪:২৫)।

প্রতিশ্রুত মসীহের শহরকে নূতন যিরুশালেম বলা হইয়াছে এবং উহা আকাশ হইতে নামিয়া আসিবে বলিয়া বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। "আর আমি দেখিলাম, পবিত্র নগরী, নূতন যিরুশালেম, স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছে।" (যোহনের প্রকাশিত বাক্য—২১ : ২)। "পরে তিনি আত্মাতে আমাকে এক উচ্চ মহাপর্বতে লইয়া গিয়া পবিত্র নগরী যিরুশালেমকে দেখাইলেন, সে স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে

নামিয়া আসিতেছিল, সে ঈশ্বরের প্রতাপবিশিষ্ট; তাহার জ্যোতিঃ বহুমূল্য মণির, স্ফটিকবৎ নির্মল সূর্য-কান্ত মণির তুল্য।" (যোহনের প্রকাশিত বাক্য—২১ : ১০-১১)।

উপরের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ, "মনুষ্যপুত্রের ন্যায়" তাঁহার শহর "নূতন যিরুশালেম, স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিয়া আসিতেছিল," তাঁহার পানীয়, "পিতার নূতন দ্রাক্ষারস" কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। ইসিয়া নবী ও সোলেমান নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইহুদী ও খৃষ্টানদের গৃহ হইতে কল্যাণ চলিয়া গিয়া উম্মতে-মোহাম্মদীর মধ্যে কায়েম হওয়ার কথা কি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিতেছে না যে, খৃষ্টান-গণের কল্পিত ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তাহাদের নবী যীশুর হস্তে প্রতিষ্ঠিত হইবে না, বরং তাহাদের গ্রন্থের প্রমাণ-মূলে উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে প্রতিশ্রুত মসীহের হস্তে সম্পাদিত হইবে? বস্তুতঃ সেইরূপই হইয়াছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দাস, তিনি নিজেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তাঁহার শহর কাদিয়ান এক অপূর্ব রুহানী শহর এবং তাঁহার বিধান তাঁহার রুহানী পিতা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিধান, যাহা খৃষ্টানগণের জন্য নূতন পানীয়।

এখানে তালমুদের একটি ভবিষ্যদ্বাণীও প্রণিধানযোগ্য। "He (Messiah) shall die and His Kingdom descend to his son and grandson." অর্থাৎ "তিনি (মসীহ) মারা যাইবেন এবং তাঁহার (স্বর্গীয়) রাজত্ব তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র পাইবেন।" বনি-ইসরাইল জাতির মধ্যে যে মসীহ আসিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র বা পৌত্র কেহ ছিলেন না এবং তাঁহার মধ্যে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার নিজ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁহার আধ্যাত্মিক-রাজত্ব বনি ইসরাইলের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়ার কথা ছিল এবং বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। কারণ হযরত মুসা (আঃ) হইতে ক্রমাগত নবীগণের আগমনের যে ধারা তাহাদের মধ্যে প্রবাহমান ছিল, তাহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার পর আর কেহ মুসবী বা খৃষ্টীয় ধর্মকে সঞ্জিবীত করিবার জন্য আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে অদ্যাবধি আসেন নাই। এতদ্বারা ইহাও সুস্পষ্ট যে, শেষ যুগে স্বর্গীয় রাজত্ব কায়েম করিতে যে মসীহ আসিবেন তিনি পুরাতন ওয়ারীশ-হীন মৃত মসীহ নহেন, পরন্তু অন্য মসীহ। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। প্রতিশ্রুত মসীহ হইলেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দাস হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)। তাঁহার এন্তেকালের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় খলিফা হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহ্মদ (রাঃ) তাঁহার রুহানী রাজত্বের অধিকারী হন এবং তাঁহার তিরোধানে তাঁহার পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহ্মদ (আইঃ) তাঁহার

স্থলাভিষিক্ত হিসাবে বর্তমানে তৃতীয় খেলাফতের আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার দ্বারা সারা বিশ্বে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ লইতেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদিগকে সুরা ফাতেহায় اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم দোওয়া শিখাইয়াছেন এবং এতদ্বারা ইহা সদা স্মরণে জাগরুক রাখিতে বলিয়াছেন যে, যে 'মোকামে মাহমুদ'কে লক্ষ্য করিয়া মানবজাতি হযরত আদম (আঃ)-এর যুগ হইতে রুহানী যাত্রা শুরু করিয়াছে এবং বিভিন্ন নবী তাহাদিগকে যাহার বিভিন্ন স্তর পার করিয়া আনিয়াছেন এবং যাহার শেষ মনযিল পর্যন্ত পৌঁছানোর ভার হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর ন্যাস্ত হইয়াছিল, উহা এখন তোমরা সম্পন্ন কর এবং বিশ্বকে সেই মনযিলে পৌঁছাও। বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে যে পর্যন্ত না মোকামে মাহমুদে পৌঁছাও, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্রাম লইওনা। ইহার জন্য দোওয়া করিয়া এবং প্রচেষ্টা চালাইয়া যাও।

বিশ্বে মোকামে-মাহ্মুদের প্রতিষ্ঠায় মানব জাতির মুক্তি

সুতরাং সকল নে'মতপ্রাপ্ত দলের নে'মত সমূহ পাওয়ার জন্য দোওয়ার অর্থ এই যে, "হে খোদা! আদমের উম্মতের পূণ্যে আমাদিগকে ভূষিত কর। অতঃপর আমাদিগকে নূহের উম্মতের উন্নত জ্ঞানের অধিকার দাও। অতঃপর মোকামে-ইব্রাহীমে আমাদিগকে খাড়া কর। অতঃপর মুসা (আঃ)-এর কওমের কামালাতে আমাদিগকে মণ্ডিত কর। অতঃপর মসীহের রুহানীয়তের সিঞ্চনে আমাদিগকে সিঞ্চিত কর এবং এইভাবে রুহানীয়তের চূড়া সমূহ মনযিলের পর মনযিল, উচ্চতার পর উচ্চতা সমূহ পার করিয়া পরিশেষে আমাদিগকে মোহাম্মদী-মোকামে প্রতিষ্ঠিত কর, যেন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রেরিতত্ব পূর্ণ হয় এবং বিশ্ব-মানব মোকামে-মাহমুদে অভিষিক্ত ও অধিষ্ঠিত হয়।" সুতরাং صراط الذين انعمت عليهم এর মর্ম হইল 'বিশ্বে পূর্ণ মানবতার শেষ মনযিল' যাহা লক্ষ্য করিয়া প্রথম হইতে কাফেলা শনৈঃ শনৈঃ আগাইয়া আসিতেছে। যুগে যুগে এই রুহানী সফরের বিভিন্ন মনযিল পার করার দায়িত্ব বিভিন্ন নবীর উপর সোপর্দ করা হইয়াছিল এবং ইহার শেষ মনযিলে পৌঁছানোর দায়িত্বভার আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপর ন্যাস্ত হইয়াছিল। এই দোওয়ার মাধ্যমে উম্মতে মোহাম্মদী আল্লাহ্তায়ালার নিকট এই দরখাস্ত করিতেছে, "হে ইলাহী! তুমি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দ্বারা ধর্মের পূর্ণতা সাধন করিয়া দিয়াছ। কিন্তু আমলের পূর্ণতা এবং সকল মানবের মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বাকী রহিয়াছে। এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এবং ইহার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমরা দণ্ডায়মান হইয়াছি।

তুমি আমাদিগকে সকল নবীর সকল কল্যাণে ভূষিত কর এবং সকল জাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কল্যাণকর জ্ঞান, শক্তি ও সফলতা দান কর। তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর এবং তত্ত্বজ্ঞানের সকল মন্‌যিল একযোগে পার করিয়া দাও এবং উম্মতে মোহাম্মদীর দ্বারা মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ কর।"

সাহাবা কেরাম (রাঃ আঃ) এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া অতীত জাতি সমূহের নৈতিক গুণাবলী নিজেদের মধ্যে একাধারে অর্জন এবং ব্যবহারে প্রদর্শন করিয়া জগতের বুকে দৃষ্টান্ত-বিহীন নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের জামাত যদি আজ আবার এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হয়, তাহা হইলে অচিরে প্রকাশ্যভাবে বিশ্বে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মোকামে-মাহমুদ প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা লাভ করিবে এবং মানবজাতি সকল প্রকার পেরেশানী ও দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

আশা করি পাঠক এখন সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, মুসলমানগণ যখন লক্ষ্যহারা ও নিরাশ হইয়া কর্ম ছাড়িয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাদিগকে জাগাইবার ও কর্মে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য কোন দুয়ার যদি খোলা না থাকে, তাহা হইলে আলোচ্য দোওয়া শিখাইবার এবং আমাদের পক্ষ হইতে উহা তোতা পাখীর ন্যায় বার বার আওড়াইবার কি প্রয়োজন?

গযব-প্রাপ্ত ও পথ-ভ্রষ্ট কাহারা?

প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতি, যে বা যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালাকে নারাজ করিয়া তাঁহার ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে, সে বা তাহারা مغضوب عليهم "গযব প্রাপ্ত" দলের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ ভাবে যে জাতি গয়ের-আল্লাহ্‌র (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের) প্রেমে বিলীন হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারা ضال "পথভ্রষ্ট।" হযরত রসুল করীম (সাঃ) স্বয়ং এই দুই শব্দের খাস অর্থ করিয়াছেন। তিনি ইহুদীগণকে গযব-প্রাপ্ত এবং খ্রীষ্টানগণকে পথ-ভ্রষ্ট বলিয়াছেন। আবু-যার গফ্‌ফারীর এক রওয়ায়েত আছে قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال اليهود وقلت الضالين قال النصارى অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র রসুলকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'গযবপ্রাপ্ত কাহারা'? তিনি বলিলেন, 'ইহুদীগণ।' আবার জিজ্ঞাসা করিলাম 'পথভ্রষ্ট কাহারা'? তিনি বলিলেন, 'খ্রীষ্টানগণ'। (ফতুহুল বায়ান)। কুরআন করীমে ইহার তসদীক রহিয়াছে। ইহুদীদের সম্বন্ধে কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ

অর্থাৎ "সুতরাং তাহারা গযবের উপর গযবকে ডাকিয়া আনিয়াছিল"। (সুরা বাকারা ১১ রুকু)। খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে, اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

"যাহারা তাহাদের প্রচেষ্টাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে ইহ জীবনের পিছনে।" (সুরা কাহাফ-১২ রুকু)। অত্র আয়াতদ্বয়ে ইহুদীদের জন্য গযব-প্রাপ্ত শব্দ এবং খ্রীষ্টানদের জন্য পথভ্রষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। الذين انعمت عليهم আয়াতের মর্ম হইল, "হে আল্লাহ্। আমাদিগকে নে'মত-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পথে পরিচালিত কর, যাহারা পরে গযবপ্রাপ্ত হয় নাই বা পরকীয় প্রেমে তোমাকে পরিত্যাগ করে নাই"। এই মযমুনে মোমেনগণের জন্য ভীতিপূর্ণ সতর্কবাণী রহিয়াছে। সব সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সেই মোকামে পেঁছায়, যাহার পর গুমরাহী নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিৎ নহে, বরং তকওয়ার পথে স্বীয় কদমকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া চলিতে থাকা কর্তব্য। যেন এমন না হয় যে, অল্প ভুলের জন্য পদস্খলিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যায়।

ভবিষ্যদ্বাণী — মুশরেকদের প্রাধান্য ক্ষণস্থায়ী

এই আয়াতের মধ্যে এক বড় রকমের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, যাহা চিন্তাশীলগণের জন্য উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। যখন সুরা ফাতেহা নাযেল হয়, তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ছিল না, বরং মক্কার কাফেরগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছিল। মক্কায় ইহুদী ও খৃষ্টানগণের সংখ্যা আটার মধ্যে লবণের পরিমান ছিল না এবং হুকুমতের মধ্যে তাহাদের কোন দখলও ছিল না। ইহা কি বিস্ময়কর নহে যে, পরিস্থিতিমূলে সুরা ফাতেহায়, "হে আল্লাহ! আমাদিগকে মুশরেকদের পথ হইতে বাঁচাও" দোওয়া শিক্ষা না দিয়া, "হে আল্লাহ! আমাদিগকে ইহুদী ও খৃষ্টানগণের পথ হইতে বাঁচাও" দোওয়া শিখাইলেন কেন? বস্তুতঃ মুশরেকদের অনুল্লেখের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, মক্কার মুশরেকদের ধর্ম ও প্রাধান্য অচিরে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানগণের ধর্ম বিকৃত হইলেও তাহাদের প্রাধান্য কায়েম থাকিবে এবং মুসলমানগণের ভীষণ ক্ষতির কারণ হইবে। মুশরেকদের বিরুদ্ধাচরণকে আল্লাহতায়ালা গণনার মধ্যে আনেন নাই। মুসলমানগণ তাহাদের সহযোগী না হইলে তাহারা মুসলমানগণের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এ যুগেও মুশরেকদের বিরুদ্ধাচরণ ক্ষণস্থায়ী ও নগণ্য হইবে। বস্তুতঃ মুশরেকগণের প্রাধান্য ক্ষণস্থায়ী। সেই জন্য সুরা ফাতেহার মধ্যে মুশরেকদের কোন উল্লেখ না থাকিয়া, ইহুদী ও খৃষ্টানগণের ক্ষতিকর

প্রভাব হইতে বাঁচিবার জন্য মুসলমানদিগকে দোওয়া শিখানো হইয়াছে যেন তাহারা ইহুদী ও খৃষ্টানগণের মধ্যে শামিল হইয়া না যায়।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের পথ হইতে বাঁচিবার জন্য দোওয়ার উদ্দেশ্য

এই আয়াত সম্বন্ধে চিন্তার আর একটি জরুরী দিক আছে। খৃষ্টানগণ মুসলমানগণকে তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত করে। সুতরাং খৃষ্টানগণের কবল হইতে মুসলমানদিগকে বাঁচাইবার জন্য দোওয়া করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইহুদীগণ কাহাকেও তাহাদিগের ধর্মে দীক্ষিত করে না। তবে কেন মুসলমানদিগকে তাহাদের পথ হইতে বাঁচিবার জন্য দোওয়া শিখানো হইয়াছে? মুসলমানগণকে গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিৎ যে তাহাদের নিজেদের মধ্যে ইহুদী ফেৎনা অন্য কোনো আকারে প্রকাশিত হইয়াছে কি না। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। শেষ (বর্তমান) যুগে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনে তাঁহাকে অস্বীকার করার ও কাফের সাব্যস্ত করার জন্য মুসলমানগণের ইহুদীসদৃশ হইয়া আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল এবং সত্যই উহা ঘটিয়াছে। তদুপরি এই যুগে খৃষ্টানগণের প্রবল আক্রমণে মুসলমানদের সংহতি ও সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার আশঙ্কা ও সর্বগ্রাসী বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানগণের জন্য এই দোওয়া যে কত জরুরী তাহা পাঠক উপলব্ধি করিবেন। মুসলমানগণ যদি এই দোওয়ার প্রতি মনোযোগী হইত এবং ইহার উপর আমল করিত, তাহা হইলে তাহারা এই দুই অগ্নি হইতে বাঁচিয়া যাইত এবং ইসলামের ইতিহাস ভিন্নরূপে রচিত হইত।

'সুরা ফাতেহা' ভাব, তথ্য ও তত্বের সীমাহীন জগত

এই সুরার ভাষা, বাক্য-বিন্যাস ও রচনা-নৈপুণ্য অপূর্ব। আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে আয়াতগুলির বন্টনের মিল এবং সামঞ্জস্য মনোমুগ্ধকর। চিন্তাশীল ব্যক্তি অল্প কয়েকটি সুবিন্যস্ত আয়াতের মধ্যে নিহিত ভাব, তথ্য, তত্ব এবং মারেফাতের এক বিশাল জগত উদ্ঘাটিত হইতে দেখিয়া বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া যাইবে। আল্লাহ্তায়ালার এক এক সেফতের সম্মুখে বান্দার এক এক দোওয়া প্রশংসায়, ভাবে এবং ভক্তিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেজদা-রত হইবে। الحمد لله "সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য" বাক্যের মোকাবেলায় ايا ك نعبد "আমরা তোমারই এবাদত করি" বাক্য রাখা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, যখনই বান্দার প্রকৃত জ্ঞান হয় যে, সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য, তখনই স্বভাবতঃ তাহার হৃদয় হইতে "আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি" বাক্য উচ্ছসিত হইয়া মস্তক সেজদায় অবনত

হইয়া যায়। অতঃপর رب العالمين "বিশ্বের রব" বাক্যের মোকাবেলায় ایاك نستعين "আমরা তোমারই সাহায্য যাচনা করি" রাখা হইয়াছে। কারণ যখনই বান্দার একীন হয় যে আমাদের খোদা প্রত্যেক অণু-পরমাণুর পর্যন্ত সৃষ্টি-কর্তা, পালন-কর্তা ও পূর্ণতা-দাতা, তখন সে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠে, "আমরা তোমারই সাহায্য যাচনা করি।" অনুরূপভাবে الرحمن "অযাচিত দানকারী" নামের মোকাবেলায় اهدنا الصراط المستقيم "আমাদিগকে সরল, সঠিক, সহজ পথে পরিচালিত কর" আয়াত রাখা হইয়াছে। যখনই বান্দা জানিতে পারে যে, তাহার খোদা বিনা আমলে অযাচিতভাবে তাহার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছেন, তখন সে পূর্ণ ভরসা ও আস্থার সহিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠে "আমাদিগকে সরল, সঠিক, সহজ পথে পরিচালিত কর। 'আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন তোমার সান্নিধ্য-লাভ। ইহার জন্য তুমি সর্বপ্রকার উপকরণ দাও।' অতঃপর الرحيم "কর্মের উত্তম ফল দাতা" নামের মোকাবেলায় صراط الذين انعمت عليهم 'নে'মত-প্রাপ্ত পুরুষগণের পথে পরিচালিত কর' রাখা হইয়াছে। যখন বান্দা অবগত হয় যে, তাহার খোদা পরিশ্রমের উত্তম ফল দিয়া থাকেন, বার বার দিয়া থাকেন, এবং বর্দ্ধিত হারে দিয়া থাকেন এবং কাহারও পরিশ্রমকে ব্যর্থ হইতে দেন না, তখন স্বতঃই বান্দার মুখ হইতে নিঃসৃত হয় যে, সরল পথে পরিচালিত করিয়া আমাদিগকে ঐ সকল নে'মতের ওয়ারীশ কর, যদ্বারা তুমি পূর্ববর্তী সুপথের যাত্রীগণকে ভূষিত করিয়াছিলে। অতঃপর مالك يوم الدين "বিচার সময়ের মালিক" আয়াতের মোকাবেলায় غير المغضوب عليهم ولا الضالين "তাহাদের পথে নহে যাহাদের উপর পরে তোমার গযব নাযেল হইয়াছে অথবা যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে" রাখা হইয়াছে। যখন বান্দার বিশ্বাস হইয়া যায় যে, খোদাতায়ালা আমাদের কার্যের হিসাব গ্রহণ করিবেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরে নিজের অপরাধ, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপের কথা স্মরণ হইয়া অকৃতকার্য্যতার ভীতি জন্মে। সুতরাং বান্দা বিচারের কথা স্মরণ করিয়া পূর্ব হইতেই আল্লাহ্-তায়ালার অসন্তুষ্টির পথ হইতে বাঁচিবার জন্য আবেদন জানায়।

এই মহান সুরার আয়াতগুলির প্রতি আরও গভীরভাবে নযর করিলে রুহানীয়তের মন্‌যিল সমূহের এক সুন্দর শৃঙ্খল দৃষ্টিগোচর হইবে এবং দেখা যাইবে যে, এক স্তর হইতে আর এক স্তর পার হইয়া কিভাবে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ করার হেদায়েত ইহার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। কোন সত্তার ফরমাবরদারী বা এবাদত দুই কারণে হইয়া থাকে। যথা, ভালবাসায় অথবা ভয়ে।

আল্লাহ্তায়ালা এই সুরায় তাঁহার উভয়বিধ সেফাতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কতক মানুষ আছে, যাহাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতার স্বভাব প্রবল থাকে। আবার

কতক লোক আছে, যাহাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা-বোধের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। তাহারা অনুগ্রহ লাভ করিলে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রয়োজনীতাও বোধ করে না। এই সকল লোক ভীতি দেখিলে ফরমাবরদারীতে মস্তক অবনত করে।

জ্ঞান-ভিত্তিক কর্ম-পদ্ধতি হইল প্রথমে ভালবাসার দ্বারা কাজ লওয়া এবং এই পন্থায় কাজ না হইলে পরে, ভয় দেখানো। তদনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালা এই সুরায় প্রথমে তাঁহার কল্যাণ-কর গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করিয়া মানুষের অন্তর ইলাহী-প্রেমে ভরিয়া যায়। যথা—তাঁহার নাম আল্লাহ্। তিনি সকল সৌন্দর্যের অধিপতি এবং সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পবিত্র। তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সকলের রিযিকদাতা। তিনি মোমেন এবং কাফেরকে সমভাবে প্রতিপালন করেন। আমাদের জীবনধারণের জন্য তিনি এমন সব বস্তুও সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি এবং আমরা যে সব ভাল কাজ করি, উহাদের উত্তম হইতে উত্তম সুফল তিনি দিয়া থাকেন। যাহারা কাহারও সৌন্দর্য্য বা এহ্সান দেখিয়া ফরমাবরদারী করিতে অভ্যস্ত, তাহারা এই সকল দেখিয়া মুগ্ধ হৃদয়ে اِيَّاكَ نَعْبُدُ "আমরা তোমারই এবাদত করি" বলিয়া তাহার সম্মুখে ঝুঁকিয়া যায়। কিন্তু যাহারা কঠিন-হৃদয় এবং ভালবাসার মর্যাদা রাখে না, তাহারা যখন مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আয়াতের উপর মনোনিবেশ করে এবং বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালা পাপ পূণ্যের বিচারের মালিক এবং একদিন তাহাদিগকে তাঁহার সম্মুখে হাজির হইয়া খোদা-প্রদত্ত সকল নে'মতের হিসাব দিতে হইবে, তখন তাহারা সভয়ে তাঁহার সম্মুখে মাথা নত করিয়া দেয় এবং বলিয়া উঠে اِيَّاكَ نَعْبُدُ "আমরা তোমারই এবাদত করি।" মোট কথা মানুষ প্রেমে মুগ্ধ হওয়ার স্বভাবেই হউক অথবা ভয়ে মাথা নত করার স্বভাবেই হউক, সুরা ফাতেহার গোড়ার আয়াতগুলি পাঠ করিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে اِيَّاكَ نَعْبُدُ "আমরা তোমারই এবাদত করি" বলিয়া ডাক দিয়া উঠে। যখন সে নিজের দুর্বলতা অনুধাবন করে এবং অপরদিকে অনন্ত গুণের অধিপতি আল্লাহ্তায়ালার সৌন্দর্য ও অনুগ্রহরাজী এবং তাঁহার মহিমা ও সর্বশক্তিমত্তা উপলব্ধি করে, তখন সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে اِيَّاكَ نَعْبُدُ "আমরা তোমারই এবাদত করি" বাক্যের সহিত اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ "আমরা তোমারই সাহায্য যাচনা করি" বলিয়া প্রার্থনারত হয়। অর্থাৎ সে বলিয়া উঠে যে, "হে প্রিয়তম! আমি তোমার ফরমাবরদার এবং আমি তোমারই এবাদত করি। আমি অজ্ঞ, আমি তোমার এবাদতের হক পুরা করিতে পারি না, সেই জন্য তোমারই সাহায্য যাচনা করি। একাজে তুমি আমার সহায়তা কর এবং এবাদতের হক আদায় করার

ক্ষমতা দাও।" যখন প্রেম এই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে এবং আল্লাহ্তায়ালার মহিমা বান্দাকে অভিভূত করিয়া দেয়, তখন মানবসুলভ স্বভাবের তাগিদে সে বলিয়া উঠে اهدنا الصراط المستقيم "আমাকে সরল, সঠিক, সহজ পথে চালাও।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছ হইতে দূরে থাকিতে পারি না। সর্বপ্রকার বক্রতা ও ত্রুটিমুক্ত এবং সব থেকে ছোট পথে চলিয়া আমি যেন সত্বর তোমার সান্নিধ্যে পৌঁছিতে পারি।" কিন্তু যেহেতু শাহী-দরবারে আম ও খাস উভয় প্রকার লোকের সমাবেশ হইয়া থাকে, সেই জন্য তাঁহার স্বভাবের কণ্ঠে বাণী ফুটিয়া উঠে صراط الذين انعمت عليهم "আমাকে নে'মতপ্রাপ্ত পুরুষগণের পথে চালাও"। অর্থাৎ "হে মওলা! তুমি আমাকে সুপথও দাও এবং আমার উপর অনুগ্রহ কর যেন পুরস্কৃত ব্যক্তিগণের সঙ্গী হই। তোমার দরবারে আমার স্থান আম লোকের মধ্যে না হইয়া যেন তোমার খাস প্রিয় বান্দাগণের মধ্যে হয়। আমি তোমার প্রেমিক হইয়াও যেন তোমার প্রেমের পাত্র হই। আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি, তেমনি তুমিও আমাকে ভালবাস।" এইভাবে বান্দা সেই ভালবাসার মোকাম যাচনা করে, যেখানে কোন পরদা থাকে না এবং প্রেমিক ও প্রেমের পাত্র এক হইয়া যায়। কিন্তু যেহেতু ঈমান ভয় ও আশার মধ্যে অবস্থিত, সেই জন্য বান্দা যখন ঈপ্সিত আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করে, তখন তাহার মন চায় যেন এই আনন্দ চিরস্থায়ী হয়। সেই জন্য আল্লাহ্তায়ালা বান্দাকে এই দোওয়া শিখাইয়াছেন যে, তুমি এই অনুগ্রহ কর যে, তোমার সহিত আমার মিলনের পর যেন আর বিচ্ছেদ না আসে। যেহেতু বিচ্ছেদের দুইটি কারণ হইয়া থাকে, যথা, (১) প্রেমাস্পদ অসন্তুষ্ট হইয়া প্রেমিককে বিতাড়িত করিয়া দেয়, অথবা (২) প্রেমিক স্বয়ং প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া সরিয়া পড়ে, সেই জন্য উভয় পরিস্থিতি হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি ইহা বলিতে শিখাইয়াছেন, غير المغضوب عليهم "তুমি আমার কোন অপরাধের জন্য নারাজ হইও না" এবং ولا الضالين "এমন না হয় যে গন্তব্যে পৌঁছিবার পূর্বে পরকীয় প্রেমে পড়িয়া আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিই।"

আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ - "যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে আমি তোমাদের উপর (নে'মত) আরও বাড়াইয়া দিব, কিন্তু যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে (জানিও) আমার আযাব কঠোর।" (সুরা ইব্রাহীম- ২য় রুকু)। যখন মুসলমান লস্কর পারস্য জয় করিয়া পারস্য রাজ্যের

রাজ প্রাসাদের ধনরাজি মদিনায় আনিয়া খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর সম্মুখে স্তূপীকৃত করিয়া দেয়, তখন তিনি কাঁদিতে থাকেন। এক সাহাবী ইহা দেখিয়া বলিলেন, 'হে উমর! আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে তাঁহার পারস্য রাজ্য দানের ওয়াদা আজ পূর্ণ করিয়াছেন ও অনুগৃহীত করিয়াছেন। আজ আমাদের আনন্দের দিন। তুমি কাঁদ কেন?' হযরত উমর (রাঃ) উত্তর দিয়াছিলেন, "দুঃখ, কষ্ট ও অভাব দিয়া এ জাতির এতদিন পরীক্ষা লওয়া হইয়াছিল। সে পরীক্ষায় তাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এখন অনুগ্রহ ও প্রাচুর্য দিয়া এ জাতির পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এই পরীক্ষায় তাহারা অকৃতকার্য হইয়া আযাবে পড়িবে, তাই কাঁদিতেছি।' দুঃখ ও কষ্টের চাপে মানুষ বিনয়াবনত থাকে, কিন্তু প্রাচুর্যে মানুষ অহঙ্কারী হইয়া উঠে এবং সে অকৃতজ্ঞ হয়। ফলে তাহার উপর আযাব নাযেল হয়। বিজয়ের পূর্বে মুসলমানগণ দুঃখ-কষ্টে আল্লাহ্তায়ালার একান্ত অনুগত ছিল এবং ছোট ছোট নে'মতেরও শুকুর-গুযার ছিল। কিন্তু যখন বড় বড় নে'মত আসিতে থাকিল, তাহারা ক্রমে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতার কর্তব্য হারাইয়া ফেলিতে ও বিপথে গিয়া আযাবে পড়িতে লাগিল। হযরত ওমর (রাঃ) মুসলমানগণের এই ভবিষ্যৎ দেখিয়া কাঁদিয়াছিলেন। তাঁহার কান্নার কারণ কিরূপ সত্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা মুসলমানদিগের ইতিহাস ও তাহাদের বর্তমান অবস্থা সাক্ষ্য দিতেছে।

এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালা কেন মানুষের কৃজ্ঞতা চাহেন? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল, কি করিল না, ইহাতে আল্লাহ্তায়ালার কিছু আসে যায় না। মানুষ অকৃতজ্ঞ হইলে, আল্লাহ্তায়ালার প্রতি তাহার স্বভাবজ আকর্ষণ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সে বিপথগামী হইয়া নিজ সৃষ্টির লক্ষ্যকে হারাইয়া বসিবে। আযাব এবং আযাবের ভীতি লক্ষ্য নহে বরং এ সব তাহাকে তাহার সৃষ্টির লক্ষ্যপথে কায়েম রাখার জন্য প্রয়োজনীয়। এমন কি দোযখও তাহার চরিত্র সংশোধন করিয়া তাহাকে তাহার সৃষ্টির লক্ষ্যপথে খাড়া করিয়া দেয়। মানুষ চিরকাল দোযখে থাকিবে না। তাহার চরিত্র-শুদ্ধি হইয়া গেলে তাহাকে জান্নাতে দেওয়া হইবে এবং সে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি বিরাগ-ব্যাধিমুক্ত হইয়া তাঁহার প্রেমের পথে অনন্ত যাত্রায় আগুয়ান হইবে। আল্লাহ্তায়ালার রহমত তাঁহার অপর সকল গুণকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুরা ফাতেহায় আল্লাহ্তায়ালার চারিটি মৌলিক গুণের মধ্যে প্রথম তিনটি যথা—রব, রহমান এবং রহীম প্রত্যেকটি তাঁহার অনন্ত অনুগ্রহ ও প্রেমের প্রকাশক এবং তৃতীয় গুণ মালেকীয়তের মধ্যেও অর্ধেক বান্দার নেক আমলের পুরস্কার-বিধায়ক অসীম অনুগ্রহের নির্দেশক এবং বাকী অর্ধেক মাত্র শাস্তি নির্দেশক। উপরে লিখিত

আলোচনা মতে এই শাস্তিরও লক্ষ্য বান্দার কল্যাণ। সুতরাং যুক্তিযুক্তভাবে তাঁহার আযাব ও আযাবের ভীতির সম্মুখে আমাদের হৃদয় প্রশ্নে উদ্বেল না হইয়া কৃতজ্ঞতায় অবনত হইয়া যায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞতার ভাব মুহূর্তের জন্যও চিন্তাশীল মানুষের মনে স্থানলাভ করিতে পারে না।

নে'মতের প্রতিক্রিয়া দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—(১) কৃতজ্ঞতা অথবা (২) অকৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার রহীমীয়তের সেফতে নে'মত বাড়াইতে থাকেন এবং তাহাকে নে'মতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। পক্ষান্তরে, অকৃতজ্ঞতা মানুষকে বিদ্রোহী অথবা পথভ্রষ্ট করিয়া দেয়। উভয় অবস্থায় অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার ভালবাসা ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হয়। আল্লাহ্তায়ালা বর্ষার ধারার ন্যায় ইহুদী জাতির উপর অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া যান, অথচ যখন তাহাদের দুর্দিনে তাহাদের চাওয়া অনুযায়ী, তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য হযরত ঈসা (আঃ)-কে নাযেল করেন, তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখান করে এবং তাঁহাকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করিতে তাঁহাকে শূলে দেয়। আল্লাহ্তায়ালার নে'মতকে তাহারা এইভাবে অভিশাপের বসন পরাইতে গিয়া নিজেরা অভিশপ্ত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে গ্রহণ করিয়া, স্বয়ং ঈসারূপী নে'মতকে খোদা বানাইয়া পূজা শুরু করিয়া দিয়া পথ-ভ্রষ্ট হইয়া গেল। এইভাবে উভয় দল খোদার সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া গেল। ইহুদী ও খৃষ্টান জাতিদ্বয় অকৃতজ্ঞতার দুই প্রান্তের দুই চরম দৃষ্টান্তস্থল। আল্লাহ্তায়ালা যেমন আমাদের সম্মুখে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্তস্থল-স্বরূপ নে'মত-প্রাপ্ত দলকে পেশ করিয়া তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য দোওয়া শিখাইয়াছেন, তেমনি অকৃতজ্ঞতার চরম দৃষ্টান্তস্থল দুই জাতিকে আমাদের সম্মুখে পেশ করিয়া তাহাদিগের পথ হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি আমাদিগকে غير المغضوب عليهم ولا الضالين দোওয়া শিখাইয়াছেন।

ধারাবাহিক নে'মত মানুষকে কঠোর হৃদয় ও অহঙ্কারী করে। বনি ইসরাইল কওমের এই অবস্থা ঘটে। একদিকে তাহারা যেমন শ্রেষ্ঠ জাগতিক নে'মত বাদশাহী লাভ করে, অপর দিকে তেমনি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক নে'মত নবুওতও লাভ করে। বিচিত্র এই জাতির ইতিহাস। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের স্তূপ যত উচ্চ, তাহাদের অবাধ্যতার স্তূপ তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের প্রতি বার বার যত অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহারা তাঁহার প্রতি বার বার তত অকৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছে। সুরা বাকারা আল্লাহ্তায়ালার এই সকল অনুগ্রহের এবং তাহাদের ধৃষ্টতাপূর্ণ অবাধ্যতার কাহিনীতে ভরপুর। হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনে তাহাদের অবাধ্যতার পেয়ালা পূর্ণ হয় এবং তাহারা

অভিশপ্ত হয়। ইহুদী জাতির ইতিহাস, অভিশাপের এক জাতীয় ইতিহাস। মুসলমানদিগকে এই ভয়াবহ পরিণাম হইতে বাঁচিবার জন্য غير المغضوب عليهم দোওয়া সতত পড়িতে বলা হইয়াছে। এই আয়াতের সবক হইল আল্লাহ্তায়ালা মানুষের ভয়ে, কোন নবীকে বাঁচাইতে জড়দেহ সহ তাহাকে আকাশে উঠাইয়া নেন না এবং যুগ যুগ ধরিয়া আকাশে জীবিত রাখিয়া পুনঃ অপরিচিত যুগের অজানা সমস্যা-নিমগ্ন অচেনা লোকদের হেদায়েতের জন্য তাঁহাকে তিনি অবতারণ করেন না। এইরূপ বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহ্তায়ালার গযবের পথে পরিচালিত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই আয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধি না করায় মুসলমানগণও অনুরূপ দুর্ভাগ্যে পতিত হইয়াছে। অতীতকে অনুধাবন করিয়া যুগ-মসীহ্কে গ্রহণ করিয়া অভিশাপের গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া নে'মতের গণ্ডিতে তাহাদের প্রবেশ করা কর্তব্য।

অপরদিকে খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদার পুত্র হিসাবে অমর জীবনে আকাশে কল্পনা করিয়া, তাঁহার পূজা করিয়া পথ-ভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহাদের আকীদা অনুযায়ী বর্তমান যুগে আকাশ হইতে তাঁহার নামিয়া আসার কথা ছিল; তাহাদের সেই প্রতীক্ষিত সময় পার হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার জাতির মধ্যে তাঁহার সময় ও কাজ শেষ করিয়া বহু যুগ আগেই স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। তাঁহার আশায় বসিয়া থাকা বৃথা। বিশেষ করিয়া খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে গ্রহণ করিয়া আকাশ হইতে নবী আসার ইহুদী-বিশ্বাসকে অসত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। মুসলমানগণও হযরত ঈসা (আঃ)-কে সত্য নবী মানিয়া ইহুদীগণকে গযবপ্রাপ্ত সাব্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং যুগের মানুষের মধ্যে প্রতিশ্রুত নবীর আবির্ভাবের তালাশ করিতে হইবে। আকাশের দিকে চাহিয়া নহে। এ যুগে যে মসীহের আসার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তিনি মোহাম্মদী মসীহ্। তিনি আসিয়া গিয়াছেন। ইহার আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। এখন গযব-প্রাপ্ত ইহুদী ও পথ-ভ্রষ্ট খৃষ্টানদিগের আকীদায় আকাশের দিকে তাকানো পরিত্যাগ করিয়া, সমাগত নবীকে গ্রহণ করিয়া, নে'মত-প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া মুসলমানদের কর্তব্য। غير المغضوب عليهم ولا الضالين বাক্যের মর্ম কথা ইহাই।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) মুসলমানদিগকে ইহুদী ও খৃষ্টানগণের পথ হইতে বাঁচাইবার জন্য কতকগুলি উপদেশ ও দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নে দুইটি হাদীসের বর্ণনা দেওয়া হইল। "পাকা সাদা চুলের রঙ পরিবর্তন কর এবং ইহুদীগণের অনুকরণ করিও না।" (তিরমিযি ও নেসাঈ)। ইহুদীগণ বার্ধক্য বশতঃ তাহাদিগের চুলে পাক ধরিলে, তাহারা চুলে কলপ না দিয়া সাদা রাখিয়া দিত। দৈহিক ভাবে ইহুদীগণ হইতে পার্থক্য রক্ষা-কল্পে তিনি মুসলমানগণকে পাকা চুলে কলপ দিতে বলিয়াছেন। সেই জন্য মুসলমানগণের মধ্যে অনেক পীর, আলেম, পাকা চুলে খেজাব লাগাইয়া থাকেন। আর

এক হাদীসে আছে: একদা মহরম মাসের ১০ম তারিখে হযরত রসুল করীম (সাঃ) আশুরার রোযা রাখিয়াছিলেন। তখন সাহাবা (রাঃ আঃ) বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ আজিকার দিনকে বড়ই সম্মানিত জ্ঞান করে। তখন আল্লাহ্‌র রসুল বলিলেন: যদি আমি আগামী বৎসর জীবিত থাকি, তাহা হইলে আমি ৯ম তারিখে রোযা রাখিব।" (মুস্লিম)। এই হাদীস দ্বারা ধর্ম বিষয়ে আমাদিগকে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত দুইটি হাদীস দ্বারা বাহ্যতঃ ছোট ছোট বিষয়েও ইহুদী ও খৃষ্টানগণ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে শিক্ষা দিয়া তিনি মুসলমানগণকে ইহুদী ও খৃষ্টানগণের চাল চলন ও আকীদা সম্বন্ধে সদা সতর্ক থাকিতে ও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া আমরা যেন তাহাদিগের অনাধ্যাত্মিক আচরণের অনুকরণ না করি, ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক কামনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমানগণ নিজেদের প্রিয় প্রভুর সতর্কবাণী শুনে নাই। যে ভয় ভীতি হইতে তাহাদিগকে তিনি সাবধান করিয়াছিলেন, তাহারা সেই ভয় ভীতিতেই নিপতিত হইয়াছে। তাহারা ইহুদীগণের ন্যায় সমাগত মসীহকে অস্বীকার করিয়াছে এবং খৃষ্টানগণের ন্যায় ঈসা (আঃ)-এর আশায় আকাশের পানে তাকাইয়া বসিয়া আছে। অথচ তাহাদিগের সম্মুখে সমাগত নবী আসিয়া অশেষ কল্যাণের ধারা তাহাদিগের জন্য প্রবাহমান করিয়া দিয়াছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানগণকে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরেকদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

"হে মোমেনগণ! ইহুদী এবং খৃষ্টানগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা পরস্পরের বন্ধু। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে, সে নিশ্চয় তাহাদের অন্তর্ভুক্ত।" (সুরা মায়েদা—৮ম রুকু)।

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

"নিশ্চয় যাহারা ইহুদী ও মুশরেক, তাহাদিগকে তুমি মানবমণ্ডলীর মধ্যে মোমেনগণের সর্বাপেক্ষা বড় দুশমন দেখিবে।" (সুরা মায়েদা—১১শ রুকু)।

কিন্তু বড় বিষময় ও পরিত্যাপের বিষয় এই যে, মুসলমানগণ খৃষ্টান আকায়েদ হইতে দূরে থাকার আদেশ শুধু উপরোক্তভাবেই অগ্রাহ্য করে নাই, বরং গত ১৪০০ বৎসর পর তাহারা আজ এক-খোদার-উপাসক শুধু মুসলমানগণ দ্বারা অধ্যুষিত আরব দেশের এক প্রধান শহর "আলহাসাতে" মুসলমানগণের মধ্যে ত্রিত্ববাদের প্রচারের জন্য খৃষ্টান পাদরীগণকে এক মিশন খোলার অনুমতি দিয়াছে। অথচ যাহারা لا اله الا الله محمد رسول الله কলেমার আত্মোৎসর্গকারী একনিষ্ঠ সেবক এবং মুসলমানদের মধ্যে যাহারা ত্রিত্ববাদের একমাত্র মূল-উচ্ছেদকারী জামাত, সেই আহমদীয়া জামাতের আরব দেশে প্রবেশ নিষেধ করা হইয়াছে। ত্রিত্ববাদের সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্-তায়ালার কঠোর মন্তব্য ভীতিসহকারে আমাদের প্রনিধানযোগ্য। নিম্নে এ সম্বন্ধে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ - وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ - اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ - وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

"নিশ্চয় কুফর করিয়াছে তাহারা, যাহারা বলে নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি মরীয়ম-তনয় মসীহ্ অথচ মসীহ স্বয়ং বলিয়াছিল, হে বনি ইসরাইল, আল্লাহ্র এবাদত কর, যিনি আমার এবং তোমাদের প্রভু। নিশ্চয় যে আল্লাহ্র সহিত শরীক করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্ত হারাম করিয়াছেন এবং জাহান্নাম তাহার আবাস হইবে। যালেমগণ কোন সাহায্যকারী পাইবে না।" (সুরা মায়েদা-১০ম রুকু)।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ - وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ - وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"নিশ্চয় কুফর করিয়াছে তাহারা, যাহারা বলে তিনের মধ্যে আল্লাহ্ এক, কিন্তু এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই। এবং তাহারা যাহা বলে, উহা হইতে যদি তাহারা বিরত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিপতিত হইবে।" (সুরা মায়েদা-১০ম রুকু)।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ
يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝

"এবং তাহারা বলে, রহমান (খোদা) নিজের জন্য এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। নিশ্চয় তোমরা এক সাংঘাতিক কথা উচ্চারণ করিয়াছ। ইহাতে আসমান সমূহ ফাটিয়া যাউক, পৃথিবী চৌচির হইয়া যাউক এবং পাহাড় সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাউক, যেহেতু তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি এক পুত্র আরোপ করিয়াছে।" (সুরা মরীয়ম-৬ষ্ঠ রুকু)।

ত্রিত্ববাদীদের উপর যে ভীষণ আযাব নাযেল হইবে, উহার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত আয়াতগুলি হইতে ইহা সুস্পষ্ট। কিন্তু ইহাতে মুসলমানগণের জন্য মহা ভীতির কারণ রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ۝

"এবং যাহারা যালেম, তাহাদের দিকে ঝুঁকিও না, পাছে তোমাদিগকে অগ্নি স্পর্শ করে, এবং তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন বন্ধু পাইবে না এবং তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।" (সুরা হুদ—১০ম রুকু)।

উপরে উদ্ধৃত এক আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা মসীহের পূজারীগণকে যালেম আখ্যা দিয়াছেন এবং তাহাদিগের জন্য অগ্নির সংবাদও দিয়াছেন। সেইজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) মুসলমানদিগকে, যাহাদিগের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করা হইয়াছে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণের আকীদা ও আচরণ হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানগণ খৃষ্টানগণের আকীদার প্রতি এমনভাবে ঝুঁকিয়াছে যে, আজ পবিত্র আরবভূমেও ত্রিত্ববাদের প্রচারের কেন্দ্রের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইহাতে অবশ্য আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বীন ইসলামের ভীতির কারণ নাই। হযরত রসুল করীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, দাজ্জাল (খৃষ্টানগণ) মদিনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছিবে এবং সেইখানে তাহারা ধ্বংস হইবে।

"আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন : রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলিয়াছেন—দাজ্জাল আসিবে, এবং মদিনার বস্তীসমূহে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। সে মদীনার এক নিকটবর্তী জায়গায় অবতরণ করিবে।" (বুখারী ও মুস্লীম)।

"আবু হোরেরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেনঃ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন—মসিহ্-দ্দাজ্জাল (পথভ্রষ্ট খৃষ্টান) পূর্বদিক হইতে আসিবে, তাহার লক্ষ্য হইবে মদীনা, এমনকি সে ওহুদের অপর দিকে নামিবে। অতঃপর ফেরেশ্‌তাগণ সিরীয়ার দিকে মুখ করিবে এবং সেখানে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" (বুখারী ও মুস্লিম)।

আজ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ পূর্ণ হইয়াছে। তাহারা ১৪০০ বৎসর পরে এখন পবিত্র আরবভূমিতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। 'আলহাসা' মদীনার পূর্ব দিকে অবস্থিত। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যৎবাণীর অপর অংশও নিশ্চিত-ভাবে পূর্ণ হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানদিগকে সুপথ দিন এবং তাহাদের রক্ষক হউন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কেবল মুসলমানদের জন্যই আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে এই গুমরাহীর যুগে মহান পথ-প্রদর্শক হইয়া আসেন নাই, বরং তিনি সর্বজাতির জন্য এ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ। সুতরাং اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ০ পাঠ করিয়া গযব ও পথ-ভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং নে'মতের পথে পরিচালিত হইবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়া করা সারা মানব-জাতির কর্তব্য। আমরা মুখে ও মনে যেন সদা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই বিনীত নিবেদন জানাই, যাহাতে বিপদরাশি হইতে বাঁচিয়া তাঁহার নে'মতের অধিকারী হইতে পারি। এই দোওয়া এত জরুরী বলিয়া আউযের মধ্যে ইহারই সংক্ষিপ্ত নিবেদন জানাইয়া কুরআন পাঠ আরম্ভ করা হইয়াছে; উম্মুল কুরআন সুরা ফাতেহার শেষাংশে এই দোয়াকে পূর্ণ রূপ দেওয়া হইয়াছে এবং কুরআন গ্রন্থের শেষাংশে দুই আউযের সুরার ব্যাখ্যা সহ এই নিবেদনেই কালামুল্লাহ্‌কে শেষ করা হইয়াছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে চেনা এবং মানা সহজ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন জাতির সহিত সম্বন্ধ কায়েম করিয়া সকলের হইয়া আসিয়াছেন। কোন জাতির সহিত একই রাজ্যে বসবাসের সম্বন্ধ, কাহারও সহিত দেশের, কাহারও সহিত ধর্মের, কাহারও সহিত বংশের সম্বন্ধ পাতিয়া এবং বিভিন্ন ধর্মে বর্ণিত নিদর্শনাবলীর পূর্ণতা সহকারে তিনি আসিয়াছেন। চিন্তাশীলগণের জন্য সত্যকে চেনার সহজ সুযোগ রহিয়াছে, যাহাতে তাহারা আযাব গযবের পথ হইতে বাঁচিয়া নে'মতপ্রাপ্ত মণ্ডলীর শামিল হইতে পারে।

আধ্যাত্মিক আরোহণ ও অবরোহন সোপান

সুরা ফাতেহায় বর্ণিত আল্লাহ্‌তায়ালার চারিটি সেফাতের অনুশীলন করিয়া কি ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভ করিতে পারা যায়, সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর

এখন উহার কিছু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। বস্তুতঃ আল্লাহ্তায়ালার রবুবীয়ত, রহমানীয়ত, রহীমীয়ত ও মালেকীয়তের গুণ চতুষ্টয় যেন আল্লাহ্তায়ালার নিকট যাইবার জন্য চারটি ধাপবিশিষ্ট এক সোপান বিশেষ, যাহা উপর হইতে বান্দার দিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সিঁড়ির উর্ধ প্রান্তে সকল প্রশংসার অধিপতি আল্লাহ্ বিরাজমান এবং ইহার নিম্নে বান্দা দণ্ডায়মান আছে। এই সিঁড়ি বাহিয়া আল্লাহ্তায়ালা বান্দার দিকে নামিয়া আসেন এবং ইহা আরোহন করিয়া বান্দা আল্লাহ্তায়ালার দিকে উর্ধগমন করে।

আল্লাহ্তায়ালা যখন বান্দার দিকে নামিয়া আসেন, তখন তাঁহার দিক হইতে প্রথম ধাপ হইতেছে রবুবীয়তের, দ্বিতীয় ধাপ রহমানীয়তের, তৃতীয় ধাপ রহীমীয়তের এবং চতুর্থ ধাপ মালেকীয়তের অর্থাৎ প্রভু বিচারকের। আল্লাহ্তায়ালার রবুবীয়তের গুণ প্রতি বিন্দু, মুহূর্ত এবং অজানা ক্ষেত্র সমূহকে ছাইয়া অনন্ত বিস্তৃত। অসংখ্য সূর্যের সমস্ত জ্যোতি একত্রে সম্পাত হইলে যেরূপ আলোক হয়, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার রবুবীয়ত গুণে তদপেক্ষা উজ্জল। সাড়ে নয় কোটি মাইল দূরে অবস্থিত এক সূর্যের দিকে আমরা তাকাইতে পারি না। অতএব অসংখ্য সূর্যের মিলিত জ্যোতি আমরা কিভাবে দেখিব? আধ্যাত্মিক চশমা ব্যতিরেকে এ ঘনীভূত অসীম আলোকের রাজ্যে আমরা অন্ধ। আল্লাহ্তায়ালার এই গুণ অনাদিকাল হইতে সর্বত্র প্রতিনিয়ত নিখুঁতভাবে ক্রিয়াশীল হওয়ায়, আধ্যাত্মিক চশমাবিহীন নেচারীদল আপন রবকে অস্বীকার করিয়া বলিতেছে যে, বিশ্ব আপনা আপনি চলিতেছে। বিশ্বের কোন কর্তার প্রয়োজন নাই এবং কোন কর্তা নাই। অথচ আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার রবুবীয়ত এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করিয়া দিলে, সব অচল হইয়া যাইবে।

এক মূর্খ ব্যক্তি অটোম্যাটিক যন্ত্রচালিত কোন আধুনিক কারখানা দেখিয়া যেমন মনে করে যে, সেখানে সব কিছু আপনা আপনি চলিতেছে এবং সেখানে কোন মানুষের প্রয়োজন নাই, তেমনি বুদ্ধিমান নেচারীগণ মনে করে বিশ্ব আপনা আপনি চলিতেছে। অটোম্যাটিক কারখানাটি যে মূল-স্থানে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং সে না থাকিলে যে অচিরেই কারখানাটি অচল হইয়া যাইবে, তাহা বিজ্ঞ নেচারী বন্ধুগণ ভাল করিয়া বুঝেন। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, কারখানাটি যত বৃহৎ ও জটিল হইবে এবং উহার পরিচালনাকে যত বেশী নিঁখুত করিতে হইবে, উহার জন্য তত উচ্চাঙ্গের সুদক্ষ পরিচালকের প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশ্বের পরিচালনার ব্যাপারে মত প্রকাশ করিতে গিয়া তাহারা হস্তিমূর্খ সাজিয়া বসেন।

আসল কথা এই যে, আমাদের দৃষ্টি এবং জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কোন জিনিস বেশী বড় হইলে আমরা উহা দৃষ্টিতে ধারণ করিতে পারি না। এক সীমা পর্যন্ত উহার সংকুচিত অবস্থা

আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আকাশ-পাতাল-জোড়া কোন বস্তুকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ধরিয়া আমরা উহা দেখিতে পারি না। কিন্তু উহাকে সঙ্কুচিত করিয়া দেখাইলে দেখিতে পারি। তেমনি জ্ঞানের ব্যাপারেও। কোন বিষয় বেশী জটিল ও ব্যাপক হইলে, আমরা বুঝিতে পারি না। উহাকে সংক্ষেপে, সহজ ও খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝাইলে বুঝি।

আল্লাহ্তায়ালাকেও আমরা অনন্ত আকারে কিছুই বুঝিতে পারি না। তিনি যখন তাঁহার অনন্ত গুণের পরিচয় খণ্ড ও সঙ্কুচিত করিয়া আমাদিগের দিকে আসিতে থাকেন, তখন আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে থাকি।

সকল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ্তায়ালা প্রতি মুহূর্তে তাঁহার অনন্ত বিস্তৃত প্রতিপালনের আলোক-ভূষণে যখন রবুবীয়তের ধাপে নামিয়া আসেন, তখন বান্দা এরূপ আলোকাভিভূত হইয়া পড়ে যে, সে চক্ষু মেলিয়া তাকাইতে পারে না। এই জন্য আল্লাহ্তায়ালা এই ধাপে সাধারণের দৃষ্টিতে অদৃশ্য। ইহার পর যখন তিনি বান্দার জন্য অযাচিত দাতার ভূষণে দ্বিতীয় ধাপে নামিয়া আসেন, তখন অপেক্ষাকৃত কম আলোকের পরিবেশে তিনি কিছু দৃশ্যমান হন। তৃতীয় ধাপে যখন তিনি সৎকর্মে পুরস্কার দাতা রূপে আরও কম আলোকের ভূষণে নামিয়া আসেন, তখন তিনি অনেক পরিমাণে দৃশ্যমান হন এবং তিনি যখন চতুর্থ ধাপে নবীগণের বিজয় এবং বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তি প্রদানের অগ্নিময় মূর্তিতে নমরূদ, ফেরাউন, হামান, আবুজেহেল ইত্যাদি ব্যক্তিবিশেষ এবং আদ, সমুদ ও লুত জাতিবর্গের ধ্বংস স্তূপের উপর প্রকাশিত হন, তখন তিনি সর্বসাধারণের নিকট সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হন।

খোদালাভের রুহানী অনুশীলনী সোপান

পক্ষান্তরে বান্দাকে আল্লাহ্তায়ালার দিকে অগ্রগামী হওয়ার জন্য নিম্নদেশ হইতে উর্ধে যাইতে হয়। বান্দার যাত্রাপথের প্রথম ধাপ বিচারকের, দ্বিতীয় ধাপ রহীমীয়তের, তৃতীয় ধাপ রহমানীয়তের এবং চতুর্থ ধাপ রবুবীয়তের। ইহার পর খোদালাভ ঘটে।

আল্লাহ্তায়ালা যখন বান্দার দিকে আসেন, তখন তিনি নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া আসেন এবং বান্দা যখন আল্লাহ্তায়ালার দিকে অগ্রসর হয়, তখন সে ক্রমঃ প্রসারশীল হইয়া অগাইয়া যায়।

সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানবকে আল্লাহ্তায়ালা উক্ত চারিটি, তথা, তাঁহার সকল গুণের প্রকাশ ক্ষমতা এবং প্রকাশের উপকরণ ও ব্যবস্থা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব মানব তাঁহার কর্মের জন্য খোদার নিকট দায়ী এবং সেই জন্য তাহার পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা।

এখন আল্লাহ্তায়ালার উল্লিখিত চারিটি গুণের কি ভাবে অনুশীলন করিলে আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিতে পারা যায়, তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

মালেকে ইয়াওমেদ্দীন সিফতের অনুশীলন

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালার দিকে যাত্রপথে আমাদিগের প্রথম পদ বিচারকের ধাপে রাখিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, মানুষের কি বিচারক হইবার যোগ্যতা আছে এবং যদি যোগ্যতা থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিবার জন্য তাহাকে ঐ ক্ষমতার কি ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে? আমরা মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে, উন্মেষিত জ্ঞান-সম্পন্ন শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত, মূর্খ হউক বা জ্ঞানী, প্রত্যেকে সদা বিচারকের আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। সম্মুখে কাহাকেও কোন কিছু করিতে বা কোন ঘটনা ঘটিতে দেখিলে অথবা কাহারও সম্বন্ধে বা কোন ঘটনার বৃত্তান্ত শুনিলে, দর্শক বা শ্রোতা, আলোচ্য ব্যক্তি বা ঘটনার বিষয়ে অবিলম্বে ভাল বা মন্দ এক বিচার করিয়া বসে। বিভিন্ন ব্যক্তির বিচার বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, কিন্তু ঠিক হউক বা ভুল হউক প্রত্যেকেই নিজের মনে একটা বিচার করিয়া থাকে। এমন কি আদালতে বিচারাসনে বসিয়া জজ যখন আসামীকে ফাঁসির হুকুম দেয়, তখন সেই আসামীও জজের রায়ের ন্যায্যতা বা অন্যায্যতা সম্বন্ধে অবিলম্বে নিজ মনে রায় দিয়া ফেলে। ইহাকে চিন্তার স্বাধীনতা বলে। দুনিয়ার কোন বাদশাহ্ বা কোন বিচারক মানব মনের এই বিচার ক্ষমতাকে কাড়িয়া লইতে পারে না। ইহা বান্দার প্রতি খোদাপ্রদত্ত দান। পিতা যেমন আপন সন্তানকে ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী শিক্ষা দিয়া থাকে (পরে সে উহার সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার যাহাই করুক না কেন), তেমনি আল্লাহতায়ালাও তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য প্রত্যেক মানবকে বিচার ক্ষমতা দিয়াছেন, যেন সঠিক পন্থায় ইহার অনুশীলন করিয়া সে আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিবার পথে অগ্রসর হইতে পারে।

বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী, সৎ এবং অসৎ প্রত্যেকেই বিচার শক্তির অধিকারী। এই শক্তিকে আমরা কি ভাবে পরিচালিত করিব? ইহার উত্তর সহজ। আমাদিগকে আল্লাহ্র রঙে রঙিন হইতে হইবে, অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা যে নিয়মে মানুষের বিচার করেন, আমরা যেন সেই ভাবে বিচার করি।

আমরা অধিকাংশ সময়ে কোন বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া মন্তব্য বা বিচার করিয়া বসি। আল্লাহ্তায়ালা যদি এইভাবে বিচার করিতেন, তাহা হইলে এক মুহূর্তের জন্যও জগৎ চলিত না। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যাইত। বিচারের নিয়ম হইল, কোন বিষয়ের আগাগোড়া তদন্ত করিবার পর ফয়সালা গ্রহণ করা। দেশের আদালতে এইভাবে বিচারের একটা চেষ্টা আছে, তাই সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা কায়েম থাকে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার পদ্ধতি নিখুঁত। তাঁহার বিচার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল :

১। অপরাধীর সম্বন্ধে ধারণামুক্ত মন লইয়া বিচার করিতে হইবে। রাগের অবস্থায় বিচার করিবে না।

২। অপরাধের আগাগোড়া জানিয়া বিচার করা উচিত।

৩। অপরাধী ব্যক্তিকে তাহার অপরাধের জন্যই শাস্তি বিধান করা উচিত। অন্যের অপরাধ তাহার অপরাধের সহিত সংযুক্ত করা উচিত নহে।

৪। অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া উচিত, যেন লঘুপাপে গুরুদণ্ড না হয়।

৫। বিচারের সময় ন্যায়দণ্ড ঠিক রাখিবে এবং অপরাধের সময় অপরাধীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নিরুপায় ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্য চুরি করিয়া খাইলে, তাহার অপরাধ অপর একজনের স্বভাব-বশতঃ খাদ্য চুরি করার অপরাধের সমান হইবে না।

৬। বিচারের সময় কাহারও পক্ষে বা বিপক্ষে সুপারীশ গ্রহণ করিবে না।

৭। আল্লাহ্তায়ালা যখন বিচার করেন তখন তাঁহার ফয়সালার মধ্যে দয়ার ভাব প্রবল থাকে। সামান্য ভাল কথায় তিনি পাপীকে ক্ষমা করিয়া দেন। বরং তাহার ব্যবহারে দেখা যায় যেন অপরাধীকে ক্ষমা করিবার জন্য তিনি অজুহাত খুঁজেন। এই জন্য তিনি নিজেকে বিচারক বলেন নাই। তিনি নিজেকে مالك يوم الدين "বিচার দিনের প্রভু" বলিয়াছেন। বিচারক অপরাধীকে ছাড়িয়া দিলে যালেম হইবে, কিন্তু প্রভু অপরাধীকে ক্ষমা করিলে দয়ালু বলিয়া অভিহিত হইবেন। عادل يوم الدين "বিচার দিনের বিচারক" না বলিয়া

বিচারের গুণের অনুশীলনে আমাদিগকে সবিশেষ সর্তক থাকিতে হইবে, যেন আমরা যালেম না হই। লেনদেনের ব্যাপারে এক টাকার পরিবর্তে যেন এক টাকার ওজনের জিনিস দিই। জিনিস দিবার সময় কম না দিই এবং লইবার সময় বেশী না লই। কাহারও ঘরে মজুরী খাটিতে মজুর যেন কাজে ফাঁকি না দেয় এবং গৃহস্থ যেন মজুরকে কম মজুরী না দেয়। মাষ্টার যেন বেতন গ্রহণ করিয়া শিক্ষকতায় ফাঁকি না দেয়। ডাক্তার যেন সমাজে তাঁহার মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রুগীগণকে ব্যবসায়ের বস্তু গণ্য না করিয়া, সেবার পাত্র হিসাবে তাহাদিগের চিকিৎসা করেন ও লেন-দেনের ব্যাপারে বিচার কায়েম রাখেন। অনুরূপভাবে আইনজীবীগণ তাঁহাদিগের মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মক্কেলগণের সহিত যেন বিচার কায়েম করেন। মক্কেলগণকে বিচার আনিয়া দিতে তাহা-দিগের প্রতি যেন তাঁহারা অবিচার না করেন। এই ভাবে যেন সকল কথা ও কাজে আমরা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ন্যায়দণ্ড কায়েম রাখি। যাঁহারা বিচারকে জীবনে

সূক্ষ্মভাবে কায়েম করেন, তাঁহারা বিখ্যাত হইয়া থাকেন। ইহা আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে পুরস্কার, যেহেতু তাঁহারা আল্লাহ্তায়ালার দেওয়া শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করেন। ন্যায় বিচারকদের সম্বন্ধে হাদিসে বর্ণিত আছে—

اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد و اخطا فله اجر واحد -

'যখন ন্যায্য বিচার করিতে বিচারক কঠোর পরিশ্রম করে এবং ঠিক বিচার করে, তখন তাঁহার জন্য দুইটি পুরস্কার থাকে, এবং যখন ন্যায্য বিচার করিবার উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু বিচারে ভুল করে, তখন তাহার জন্য একটি পুরস্কার থাকে।'

(সহি বুখারী ও মুস্লীম)।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আদর্শ এবং শিক্ষার ফলে সাহাবীগণের মধ্যে কিরূপ সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল।

এক সাহাবী (রাঃ) একটি ঘোড়া বিক্রয় করিতে ১০০০ দিনার চাহিলেন। ক্রেতাও এক সাহাবী (রাঃ) ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'উহার মুল্য ২০০০ দিনার এবং ইহার কম মূল্যে তিনি ঘোড়াটি খরিদ করিবেন না'। বিক্রেতা বলিলেন, 'ভাই, ঘোড়া আমার। আমিই উহার মুল্য সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী জানি। উহার মূল্য ১০০০ দিনারের উর্ধে এক দিরহামও বেশী নহে।' ক্রেতা বলিলেন, 'ভাই, ঘোড়া তোমার হইতে পারে। কিন্তু আমি ঘোড়ার জহুরী। তোমার ঘোড়ার মূল্য আমি বেশী বুঝি। ২০০০ দিনারের কম মূল্যে তোমার ঘোড়া লইলে, তোমাকে ফাঁকি দেওয়া হইবে এবং আমার বিবেক কলুষিত হইয়া যাইবে এবং তজ্জন্য কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্তায়ালার নিকট আমাকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। এ কাজ আমি করিতে পারি না।' তখন বিক্রেতা বলিল, 'আমিও ভাই আমার ঘোড়ার মূল্য জানি। তোমার নিকট ১০০০ দিনারের বেশী মূল্য লইলে, তোমাকে ফাঁকি দেওয়া হইবে এবং আমার বিবেক কলুষিত হইয়া যাইবে এবং তজ্জন্য কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্তায়ালার নিকট আমাকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। আমিও এরূপ বেচাকেনায় রাজি হইতে পারি না।'

দুঃখের বিষয় বর্তমান জগৎ ইহার উল্টা পথে চলিতেছে এবং ইহারই ফলে সর্বত্র অশান্তি ও হাহাকার।

কাহারও সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও এক ন্যায়দণ্ড আছে। সম্যক না জানিয়া যেন কাহারও বিরুদ্ধে আমরা কোন প্রকার সমালোচনা না করি। এই নীতি অনুসরণ করিলে আজ জগতের অর্ধেক দুঃখ ও বিপদ লাঘব হইয়া যাইত।

আর কাহারও কুসমালোচনা করিতে পারে না। সে তখন মানুষের মধ্যে কেবল গুণই দেখে এবং তাহারই আলোচনা করে। ফলে সমাজের মধ্য হইতে মন্দ চলিয়া যায় এবং কল্যাণ প্রেম, শান্তি ও সুখ আসিয়া মানব সমাজকে এক উচ্চতর স্বর্গের পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়।

রহমানীয়তের অনুশীলন

যখন মানব রহীমীয়তের ধাপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তখন আল্লহ্তায়ালার রহীমীয়তের গুণ-সম্পাতে তাহার অন্তরে রহমানীয়তের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয়। এই স্তরে আমাদিগকে অযাচিত দানের অনুশীলন করিতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত বিনা মজুরীতে কাহারও কাজ করিয়া দেওয়া। পাড়ার কোন মেধাবী ছাত্র আছে, তাহার গৃহ-শিক্ষক নাই; পড়া কিছু দেখাইয়া দিলে সে ভাল ফল করিতে পারে। এইরূপ ছাত্রকে কোন শিক্ষিত প্রতিবেশী বিনা বেতনে এবং কোন প্রকার প্রতিদান পাইবার বাসনা না রাখিয়া নিজের কিছু সময় ও মেহনত দিয়া গরীব ছাত্রটিকে পড়াইতে পারে। ঐ ছাত্রটিও বিনা অহ্বানে আসিয়া প্রতিবেশীর কিছু কাজ করিয়া দিতে পারে। পথ চলিতে পথহারা অন্ধকে, নিজ কাজ রাখিয়া, হাত ধরিয়া গন্তব্য স্থানে দিয়া আসা কোন কঠিন কাজ নহে। অর্থশালী ব্যক্তি অভাবী প্রতিবেশীকে অযাচিত ভাবে কিছু অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারে। কেহ কোন অক্ষম ভারবাহীর ভার উত্তোলনে সাহায্য করিতে পারে। মক্কা-বিজয়ের দিনে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এক পলায়নপর অক্ষম বৃদ্ধার ভার বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার ঘটনা রহমানীয়তের গুণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মোটকথা ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, মহাজন ও খাতক ইত্যাকার ভাবে সকলেই আপন আপন ক্ষেত্রে এই গুণের অনুশীলন করিতে পারে।

যখন বান্দা এই স্তরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়, তখন তাহার উপর আল্লাহ্তায়ালার রহমানীয়তের মহিমা-সম্পাত হয়। রহমানীয়তের ময়দান বড়ই বিস্তৃত। এই পর্যায়ে আল্লাহ্তায়ালা বান্দাকে বহু কিছু শিক্ষা দিয়া থাকেন। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন الرحمن علم القرآن 'রহমান (খোদা) কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন।'

(সুরা রহমান, ১ম রুকু)।

রবুবীয়তের অনুশীলন

আল্লাহ্তায়ালার কালামের নযুল তাঁহার রহমানীয়তের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। যাহারা আল্লাহ্তায়ালার কালাম লাভ করেন, তাঁহারা দ্রুত রবুবীয়তের স্তরের দিকে

আগাইয়া যান। যাহারা আল্লাহ্তায়ালার কালামকে মর্যাদা দেয় না, তাহারা কখনও আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিতে পারে না। অক্ষর পরিচয়ে যে অবিশ্বাসী, সে যেমন কখনও বিদ্যা অর্জন করিতে পারে না, তেমনি খোদার কালামের অনুশীলনে যে অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারী, সে কখনও খোদাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

গৃহস্বামী যেমন আগাইয়া গিয়া অতিথিকে আপন গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া আনে, তেমনি আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার দিকে আগমনকারী বান্দাকে প্রত্যেক ধাপে যথাযোগ্য ভূষণে আগাইয়া নিয়া পরবর্তী উর্ধতন মর্যাদায় আনিয়া সমাসীন করেন। যখন বিচারকের শ্রেণীতে বান্দা উত্তীর্ণ হয়, তখন আল্লাহ্তায়ালা বিচারের প্রভুরূপে তাহাকে রহীমীয়তের শ্রেণীতে আগাইয়া আনেন, যখন রহীমীয়তের শ্রেণীতে সে উত্তীর্ণ হয়, তখন রহীম রূপ ধরিয়া তিনি তাহাকে রহমানীয়তের শ্রেণীতে আগাইয়া আনেন এবং যখন রহমানীয়তের শ্রেণীতে সে উত্তীর্ণ হয়, তখন তিনি তাহাকে রহমান রূপে রবুবীয়তের শ্রেণীতে আগাইয়া আনেন। রবুবীয়তের কাজ পিতামাতার কাজের অনুরূপ। গৃহে দুগ্ধ ও খাদ্য রাখিয়া পিতা-মাতা এ কথা মনে করে না যে, সন্তান নিজে গিয়া লইয়া খাইবে। বরং তাহারা তাহাকে আনিয়া খাওয়ায় এবং খাইতে না চাহিলে, জোর করিয়া খাওয়ায়। এই স্তরের বান্দা দুনিয়ার পিতামাতা-স্বরূপ হইয়া যান। তিনি মানুষের পিছনে পড়িয়া তাহাদিগকে সত্য গ্রহণ করান। রবুবীয়তের স্তরে অবস্থিত বান্দা জনগণের কল্যাণের জন্য সদা চিন্তাশীল থাকেন। তিনি নিজের সুখ, স্বচ্ছন্দ বা কষ্টের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। কিসে আল্লাহ্তায়ালার বান্দাগণের মঙ্গল হইবে সেই চিন্তায় তিনি সদা বিভোর থাকেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলে পাঠক বুঝিবেন।

একবার হযরত রসুল করীম (সা:) তবলীগের জন্য তায়েফ গিয়াছিলেন। সেখানকার লোক তাঁহাকে পাথর মারিয়া রক্তাক্ত কলেবর করিয়া তাঁহার পিছনে কুকুর লেলাইয়া দেয়। ফিরার পথে তিনি এক বাগানে আরাম করিতে বসেন। বাগানওয়ালা নিজ গোলামের মারফৎ তাঁহাকে কিছু ফল পাঠাইয়া দেয়। তিনি ফলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই গোলামকে তবলীগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অভ্যাস ছিল যে, হজের সময় যখন হাজীগণ আসিত, তিনি তাহাদিগের তাঁবুতে গিয়া তবলীগ করিতেন। তিনি ইহার অপেক্ষা করিতেন না যে, কেহ তাঁহার নিকটে আসিবে, তবে তিনি তবলীগ করিবেন। তিনি সদা স্বয়ং মানুষের অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে সত্যের প্রচার শুনাইতেন, যেভাবে পিতামাতা আপন সন্তানকে খুঁজিয়া আনিয়া তাহাকে আহার করায় যেন সে ক্ষুধার্ত না থাকে।

এই স্তরের বান্দাগণের মধ্যে নবীগণ শীর্ষ-স্থানীয় হইয়া থাকেন। মোহাদ্দেছ, মোজাদ্দেদ এবং নি:স্বার্থ ধর্ম প্রচারকগণও এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু তাঁহারা আংশকিভাবে আল্লাহ্তায়ালার রবুবীয়তের প্রকাশের স্থল হইয়া থাকেন।

সৃষ্টির সেবায় নবী

এই স্তরের বান্দা বিশেষ করিয়া নবীগণ, পিতা-মাতার ন্যায় জনগণের হিতার্থে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র বাণী শুনাইয়া থাকেন। মানুষ তাঁহাদের কথা না শুনিলে বা বিরুদ্ধাচরণ করিলেও, তাঁহারা কর্তব্য হইতে পশ্চাদপদ হন না। রুগ্ন সন্তান ঔষধ খাইতে অস্বীকৃতি জানাইয়া হাত পা ছুড়িয়া পিতা-মাতাকে মারিলেও তাহারা যেমন তাহাদিগের কর্তব্য হইতে নিরস্ত হয় না, আল্লাহ্‌তায়ালার নবীগণ মহা বিরোধীতা সত্ত্বেও জনগণকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা হইতে বিরত হন না। ফলে তাঁহারা এমন এক দল লোককে পান, যাহারা সকল অবস্থায় তাঁহাদের অনুগামী হন এবং তাঁহারা তাহাদিগকে শিক্ষা দেন, শুদ্ধ এবং পবিত্র করেন। তাহাদিগকে কষ্ট দিলে অথবা শাস্তি দিলেও তাহারা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালাকে লাভ করিবার জন্য যুগ-নবী ইহলোকে আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে আধ্যাত্মিক মহা-ডাইনামো-স্বরূপ হইয়া থাকেন। গৃহ যতই বিজলী বাতির সুন্দর উপকরণে সজ্জিত হউক না কেন, গৃহের তার যেমন ডাইনামোর সহিত সংযুক্ত না হইলে গৃহ আলোকিত হয় না, তেমনি যুগনবীর সহিত এবং তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত না হইলে, অন্তরে ঐশীবাতি জ্বলিবে না। এই জন্য নবীর সত্য অনুগামীর দল কোন অবস্থাতেই জামাত পরিত্যাগ করেন না। সকল দুঃখ ও সকল ত্যাগ স্বীকার করিতে তাঁহারা সদা প্রস্তুত থাকেন। উত্তরকালে নবীর অবর্তমানে, নবীর শিক্ষাকে তাঁহারা জনগণের মধ্যে প্রচার করেন এবং তাহাদিগকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলেন। এই ভাবে নবীর সিলসিলা আগে চলিতে থাকে এবং তিনি সদা সকলের পিতার স্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই পদে অধিষ্ঠিত মহাপুরুষের সহানুভূতি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কল্যাণকামী হইয়া থাকেন।

সারা প্রকৃতি যেরূপ মানবজাতির জড় কল্যাণে নিয়োজিত, তেমনি একাই তিনি একাধারে সকল সৃষ্টির খেদমত আধ্যাত্মিকভাবে মানবজাতিকে পৌঁছাইয়া থাকেন। তিনি সমগ্র মানবজাতির উপর সূর্যের ন্যায় আলোক বিস্তার করেন এবং চন্দ্রের ন্যায় খোদাতায়ালার নিকট হইতে আলোক আহরণ করিয়া সেই আলো অন্যদের নিকট পৌঁছান। তিনি দিবসের ন্যায় উজ্জল হইয়া সাধুতা ও কল্যাণের পথ লোকদিগকে প্রদর্শন করেন। তিনি রাত্রির ন্যায় প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তির লজ্জাবরণ করেন এবং ক্লান্ত শ্রান্তদিগকে আরাম পৌঁছান। তিনি আকাশের ন্যায় প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তিকে আপন ছায়ার নীচে স্থান দেন এবং যথাসময়ে তাহার উপর আপন অনুগ্রহ-বারি বর্ষণ করেন। তিনি ভূমির ন্যায় বিনয় দ্বারা প্রত্যেকের

আরামের জন্য শয্যার ন্যায় হইয়া যান এবং সকলকেই তাঁহার সৌজন্যের অঞ্চলে গ্রহণ করেন এবং নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক ফল তাহাদের জন্য পেশ করেন। এইভাবে তিনি সৃষ্টির সত্যিকার সেবক হইয়া যান। তিনি সকলের কল্যাণে নিজের কল্যাণ এবং সকলের আনন্দে নিজ আনন্দ জ্ঞান করেন।

সকল প্রশংসার অধিপতির বিকাশক 'প্রশংসিত' নামের হকদার

এই স্তরের মহাপুরুষগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রবুবীয়তের পূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের প্রকাশকারী ছিলেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)। তিনি ব্যতিরেকে অপর কেহ এই মর্যাদা লাভে সক্ষম হন নাই। তিনি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের প্রধান ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তীগণের প্রধান এ জন্য ছিলেন না যে তিনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, বরং এই জন্য যে, তাঁহারা আসিয়াছিলেন জনগণকে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে। তিনি পরবর্তীগণের জন্য শিক্ষক এই কারণে যে, তাঁহার অনুগমন ব্যতিরেকে আল্লাহ্তায়ালাকে লাভের কোন পথ না থাকায়, তাঁহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াই আল্লাহ্কে লাভ করেন এবং করিতে থাকিবেন। পূর্ববর্তী নবীগণ খোদাতায়ালার যুগোপযোগী রবুবীয়তের প্রকাশের স্থল ছিলেন, কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন মহানামধারী আল্লাহ্র পূর্ণ প্রকাশের স্থল। পূর্বালোচিত চারিটি মৌলিক গুণ তথা সকল গুণের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ এবং তিনি সকল ত্রুটি, দোষ এবং দুর্বলতা হইতে মুক্ত। এই জন্য সকল প্রশংসা তাঁহার। সুরা ফাতেহার প্রারম্ভে তাই اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ "সকল প্রশংসা আল্লাহ্র" বলা হইয়াছে। এইরূপ সকল প্রশংসার অধিকারীর যিনি প্রকাশের স্থল হন, তিনিও اَلْحَمْدُ "সকল প্রশংসা"র যোগ্য। প্রতিবিম্ব আসলের অনুরূপ হইয়া থাকে। এই জন্য হযরত রসুল আকরাম (সাঃ)-এর নাম مُحَمَّدٌ মোহাম্মাদ (সাঃ) অর্থাৎ "প্রশংসিত।" সকল প্রশংসা তাঁহার মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। মোহাম্মাদ (সাঃ) নাম ব্যতিরেকে "খাতামান্নাবীয়ীন" হওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং তাঁহার সফল নাম তাঁহার খাতামান্নাবীয়ীন হওয়ার অকাট্য প্রমাণ।

মোহাম্মাদ (সাঃ) নামের মধ্যে আহ্মদ (আঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নামের মধ্যে এক আহ্মদ "প্রশংসকারী"-র আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে। কারণ যিনি প্রশংসিত তাঁহার প্রশংসাকারীর প্রয়োজন রহিয়াছে। গত চৌদ্দ শত বৎসরে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রশংসা সাহাবা কেরাম (রাঃ আঃ) ইমাম, মোজাদ্দেদ, আওলিয়া এবং বহু বুযুর্গানে দীন করিয়াছেন। কিন্তু গত শতাব্দীর

শেষভাগে যখন মুসলমানগণ খোদার সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইল এবং খ্রীষ্টান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, নাস্তিকগণ একযোগে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিল, তখন তাহারা যেমন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কুৎসায় মুখর হইয়া উঠিল, মুসলমানগণও তেমনি বুদ্ধির দোষে বহু কেচ্ছা-কাহিনী বানাইয়া দুশমনগণের জন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কুৎসার খোরাক যোগাইল। ফলে মুসলমানগণ বিরুদ্ধবাদীগণের কুৎসার জবাব দিতে পারিল না এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে কুৎসার হিমালয় খাড়া হইয়া উঠিল। এমন সময়ে খাতামান্নাবীয়ীন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রকাশিত সকল কুৎসাকে খণ্ডন করিয়া তাঁহার পূর্ণ প্রশংসা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথই যে আল্লাহ্‌কে লাভ করার জন্য একমাত্র পথ, তাহা সাব্যস্ত করার জন্য এক "আহ্‌মদ" এর আগমনের প্রয়োজন ছিল। তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)। তিনি যথা-সময়ে আসিয়া তাঁহার কার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া ছিলেন। তিনি লিখায়, কথায় এবং কাজে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এরূপ প্রশংসা ও খেদমত করিয়াছেন যে, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা, চরিত্র ও আদর্শকে রাহুমুক্ত করিয়া আবার সূর্যের ন্যায় সমুজ্জল করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি নিজ জীবন-দর্পণে তাঁহার শিক্ষা, চরিত্র এবং আদর্শকে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পুর্ণ প্রতিচ্ছায়ারূপে তিনি এ যুগে رب العالمين জগত-সমূহের রবের দ্বিতীয় প্রকাশের স্থল। তাঁহার অনুগমনের দ্বারাই এখন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুগমন সম্ভব। অন্যথায় নহে। এই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার উপর ইলহাম করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর বিশ্বাস না আনিয়া খোদাকে লাভ করা যাইবে না। এ যুগের জন্য সকল নবীর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার মধ্যে পূর্ণ হইয়াছে এবং তিনি সকল নবীর সত্যতাকে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হিংসা বিদ্বেষ দূর করিয়া সকল ধর্মের সমন্বয় করিয়া ইসলামের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনিই আজ সকল খোদালাভেচ্ছুগণের জন্য আদর্শ। ইহা এই জন্য যে, তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর খাদেম এবং তাঁহার পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া। এই মর্যাদা এমন যে, যে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, সে-ই আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ রবুবীয়ত হইতে আশিস লাভ করিবে এবং যে কেহ তাঁহার সহিত সম্বন্ধ কাটিয়া ফেলিবে, সে আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ রবুবীয়তের ছায়া হইতে বাহির হইয়া যাইবে। সকল নবীই আল্লাহ্‌তায়ালার পুর্ণ রবুবীয়তের প্রকাশের স্থল ছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তীগণের পূর্ণতা ছিল আপন আপন যুগ ও জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্ণতা সকল দেশ, সকল জাতি ও সর্ব কালের জন্য। তিনি সকল নবীর শিরোদেশে শোভা বর্ধন করিতেছেন।

ঐশীগুণের অনুশীলন অনুযায়ী মর্যাদা-লাভ

এখন প্রশ্ন থাকে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুগমনের ফলে আমরা যে উপরে বর্ণিত স্তরগুলি পার হইতেছি তাহা কি ভাবে বুঝিব? স্কুল-কলেজে ছাত্র যে ভাবে এক শ্রেণী হইতে উপরের শ্রেণীতে উঠে, এ পথেও প্রায় সেইরূপই হয়। কোন ক্লাসের ছাত্র যখন পড়াশুনায় সকল বিষয়ে এক নির্দিষ্ট মানের জ্ঞান অর্জন করে, তখন তাহাকে উপরের শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। আধ্যাত্মিক পথেও আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি অনুরূপ কল্যাণ প্রদর্শন করেন। উন্নতির জন্য ছাত্রকে কোন বিষয়ে পুরা নম্বর রাখিতে হয় না। বরং এক নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর রাখিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর না পাইলে, তাহাকে উপরের শ্রেণীতে উন্নীত করা হয় না। এই ব্যবহারের মধ্যে কঠোরতা আছে। কোন এক বা একাধিক বিষয়ে পূরা নম্বর পাইলেও, কোন কোন বিষয়ে ফেল করিলে তাহাকে উন্নীত করা হয় না। ইহা ব্যতিরেকে পাশের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর না পাইলে, নম্বরগুলি বেকার যায়। কিন্তু অসীম এবং অনন্ত দয়ালু আল্লাহ্ বান্দার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। আধ্যাত্মিকতার প্রত্যেক স্তরেই অনুশীলন করার বহু বিষয় আছে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা বান্দাকে শ্রেণী বিভাগে উন্নতি দানে প্রত্যেক বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর রাখার অপেক্ষা রাখেন না। যে কোন বিষয়ে বিন্দু পরিমাণ পুণ্য করিলে, তিনি উহারও পুরস্কার দিয়া থাকেন এবং বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করিলে শাস্তিও দিয়া থাকেন।

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٥ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ٥

"যে কেহ এক বিন্দু পরিমাণ পূণ্য করিবে, সে উহা দেখিবে এবং যে কেহ এক বিন্দু পরিমাণ মন্দ করিবে, সে উহা দেখিবে।" (সুরা যিলযাল)।

আল্লাহ্তায়ালার এই বিধানের অধীনে বান্দা একই সময়ে তাহার আমল অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করিতে পারে।

পূণ্যের পুরস্কার বর্ধিত হারে ও পাপের প্রতিফল সম পরিমাণে

আমলের প্রতিদান সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালার বিধান এই যে:—

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ـ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون ٥

"যে কেহ একটি পুণ্য কাজ করিবে, সে উহার অনুরূপ দশ গুণ পাইবে, কিন্তু যে কেহ একটি মন্দ কাজ করিবে, সে উহার অনুরূপ একটি প্রতিদান পাইবে এবং তাহাদিগের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।' (সুরা আনআম—শেষ রুকু)।

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ٥

'যাহারা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করে, তাহাদের (পুরস্কারের) দৃষ্টান্ত একটি শষ্যের বীজের ন্যায়, যাহা সাতটি শিস উগ্‌দত করে, এবং প্রত্যেক শিসে একশত করিয়া শষ্য-বীজ থাকে। এবং আল্লাহ্‌ আরও বাড়াইয়া দেন যাহার প্রতি চাহেন, এবং তিনি প্রসারতা-দানকারী, সর্বজ্ঞ।' (সুরা বাকারা—৩৬শ রুকু)।

উপরে বর্ণিত আয়াতদ্বয় হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কোন ভাল কাজের পরিবর্তে ১০ হইতে ৭০০ এবং আরও অধিক গুণ পুরস্কার দেন, যেহেতু তিনি প্রসারতা-দানকারী বদান্যশীল। পুণ্য কাজ করার সময় যে আন্তরিকতা, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার গোচরে থাকে। তাই তিনি সর্বজ্ঞ হিসাবে পুণ্য কাজের সময় যাহার আন্তরিকতার যে পরিমাণ গভীরতা থাকে, তাহাকে তিনি তদনুযায়ী ১০ হইতে বহুগুণ পুরস্কারে ভূষিত করেন। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের প্রতিদানে একটি ক্ষতিই দিয়া থাকেন। ইহা এই জন্য যে, সাজা একাধিক গুণ হইলে তিনি অবিচারী হইয়া যান।

দৈহিক সফরে গতিবেগ মন্থর এবং রুহানী সফরে সতেজ

পুণ্যের পথে আধ্যাত্মিক যাত্রীর গতি প্রথমে মন্থর থাকে, কিন্তু পথচারী যতই আগাইয়া যায়, তাহার গতিবেগ ততই বাড়িতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, বর্ধিতহারে পুণ্যের পুরস্কার লাভের সহিত পুণ্যশীলের আধ্যাত্মিক শক্তি অনুরূপ গুণে বাড়িয়া যায় এবং ফলে পুণ্যশীল ব্যক্তির গতি গুণিতকের হারে বাড়িতে থাকে। জাগতিক দৈহিক গতি ইহার উল্টা। আমরা যখন পদব্রজে যাত্রা করি, তখন আমাদিগের গতি দ্রুত থাকে, কিন্তু ক্রমে মন্থর হইয়া অবশেষে বিশ্রামের জন্য আমাদিগকে বসিয়া পড়িতে হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক-যাত্রার বিশ্রামে আরাম নাই, গতিবেগ বর্ধনে আরাম। জড় জগতের নিয়মে আমাদিগের দেহ বয়োবৃদ্ধির সহিত স্থবির ও অচল হইতে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে আমরা ক্রমোন্নত যৌবনের দিকে ছুটিয়া চলি। ফলে বেহেশ্‌তে কেহ বৃদ্ধ থাকিবে না এবং সেখানে অনন্তকাল ব্যাপিয়া আমাদিগের যৌবনের নব নব রূপ, গুণ ও শক্তির ক্রমঃবিকাশ হইতে থাকিবে।

সুরা ফাতেহা রুহানী সফরে রক্ষাকবচ

যেহেতু আধ্যাত্মিক যাত্রীর গতি দ্রুততর হয়, সেই জন্য সাবধান হইয়া না চলিলে, সদা তাহার পতনের আশঙ্কা থাকে। দ্রুতগতির মধ্যে পতনের বিপজ্জনক ফল আধ্যাত্মিক

যাত্রাতেও ঘটে। এইরূপ বিপদ হইতে বাঁচিবার জন্য সুরা ফাতেহাকে আমাদিগের রক্ষাকবচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জাতিগত কল্যাণলাভ ও ধ্বংসের চক্রশেষে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা

আমরা এতক্ষণ ব্যক্তির রুহানী সফরের কথা আলোচনা করিলাম। কিন্তু আল্লাহ্-তায়ালার প্রেরিত নবী এক বা দুইজনকে গুমরাহী হইতে ব্যক্তিগতভাবে উদ্ধার করিয়া খোদাতায়ালার নৈকট্যের পথে তুলিতে আসেন না। তিনি যে জাতির জন্য প্রেরিত হন, তিনি সেই জাতিকে সমগ্রভাবে উন্নত করিয়া যান। তিনি সমষ্টিগতভাবে সারা জাতিকে পশুর স্তর হইতে উত্তোলন করিয়া, ন্যায়-বিচার, রহীমীয়ত ও রহমানীয়তের স্তর সমূহ পার করিয়া জড় আসক্তি হইতে মুক্তি দিয়া রবুবীয়তের আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন আল্লাহ্তায়ালা সেই জাতিকে তাঁহার খেলাফতের চাদর পরাইয়া দেন এবং সেই জাতি জাগতিক রাজ্যের অধিপতি হইয়া যায়। আল্লাহ্তায়ালা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মারফত ইহুদীগণকে তাঁহার এই দ্বিবিধ নে'মত দানের কথা স্মরণ করাইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে নবুওত এবং বাদশাহাত দানে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। বাদশাহাত সদা গোলামের ন্যায় নবুওতের পিছনে দৌড়ায়। কিন্তু বাদশাহাত লাভের পর অনুগৃহীত জাতির দৃষ্টি আধ্যাত্মিকতা হইতে জড়ের দিকে নিবদ্ধ হইতে থাকে। ফলে ঐ জাতির পতন আরম্ভ হইয়া যায় এবং তাহারা খোদা হইতে বান্দার দিকে লম্বমান আধ্যাত্মিক সিঁড়ি বাহিয়া অধোগামী হইতে থাকে। এইরূপে রবুবীয়ত হইতে বিচারের ধাপে নামিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয় না বরং তাহারা সিঁড়ি ছাড়িয়া একেবারেই পশুর স্তরে মিশিয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি ন্যায় বিচারের স্তরেও কায়েম থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্-তা'লা সেই জাতিকে জাগতিক রাজত্বে কায়েম রাখেন। কিন্তু বিচারকের স্তরের নীচে আর পুরস্কার নাই। তাই তাহারা যখন পশুত্বের স্তরে নামিয়া যায়, তখন তাহারা আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য ও অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায় এবং অন্য পাপাচারীদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া অবশেষে রাজ্যহারা হয়। কিন্তু পরে যখন সকল দুষ্টের দল মিলিয়া জগতে অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা বাধাইয়া দেয়, তখন আবার আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগের নিকট নবী প্রেরণ করিয়া দুষ্টের ধ্বংস সাধিত করিয়া এক পবিত্র জামাত প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন আবার পুণ্যের যুগ আরম্ভ হয়। এইভাবে পাপ ও পুণ্যের চক্র চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন শেষ যুগ। এখন শয়তান চিরতরে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে এবং রহমতুল্লিল-আলামীন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পুণ্য ও শান্তির স্বর্গরাজ্য সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্তায়ালা বর্তমান যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে পাঠাইয়া আহ্মদীয়া

জামাতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সারা জগতের সকল জাতি অচিরেই কল্যাণে ভূষিত হইবে। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে আল্লাহ্তায়ালা এক এক জাতির জন্য এক এক যুগে খণ্ড খণ্ড আকারে তাঁহার সেফত চতুষ্টয়ের প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই শেষ যুগে সারা বিশ্বে তিনি তাঁহার গুণরাজির পূর্ণ প্রকাশ করিবেন। আল্লাহ্তায়ালার মালেকে ইওমেদ্দীনের হস্ত এখন সারা জগতে কর্মতৎপর। যাহারা আল্লাহ্তায়ালার পথে আসিয়া পুণ্যবান হইবে, তাহারা পুরস্কার লাভ করিবে এবং যাহারা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণে অস্বীকার করিবে, তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ইহার পর জগত মহা কল্যাণের পথে উন্নতি করিয়া চলিতে থাকিবে।

'সুরা ফাতেহা আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর কল্যাণ হইতে অধিকতর কল্যাণের পথে চলিবার এবং শিথিলতা অথবা অধোগতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অপরিহার্য ও একান্ত সহজলভ্য রক্ষাকবচ।

খোদা ও সৃষ্ট জগতের এবং খোদা ও বান্দার নিখুঁত পরিচয়, উভয়ের সম্বন্ধ, বান্দার জীবনের উদ্দেশ্য, খোদা ও বান্দার সহিত মিলনের পন্থা ও পথ, ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ লাভের উপায় ইত্যাদি বিষয়াবলী এই সুরার অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে এমন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা সেই প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ খোদা ছাড়া আর কাহারও দ্বারা এভাবে সকল বিষয় এত অল্প কথায় পূর্ণাঙ্গীনভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব ছিল না। এই সুরা যেন স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে দেখিবার দর্পন-স্বরূপ। ইহা ইহকাল ও পরকালের সংক্ষিপ্ত সার। ইহার দৃষ্টান্ত, যেন অসীম সমুদ্রকে একটি বিন্দু বা একটি অণুর মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছে, অথচ ইহার যে কোন অংশ স্পর্শ করিলে সুনিশ্চিত জ্ঞানের অসীম সমুদ্র উথলিয়া উঠে এবং সম্মুখে ইহকাল ও পরকালের অপূর্ব রহস্য-সমূহ উদ্ভাসিত হইতে থাকে।

আল্লাহ্তায়ালাকে ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে লাভ করিবার জন্য এই সুরায় অব্যর্থ ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেই ব্যবস্থাকে আল্লহ্তায়ালা কার্যকরী করিয়া ব্যক্তি ও জাতিকে সান্নিধ্য দিবার জন্য পুরস্কার-প্রাপ্ত দলের অর্থাৎ নবী ও খলিফার নিযাম কায়েম করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে নিজস্ব পন্থায় খুঁজিয়া বাহির করিবে বা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবে, এ ক্ষমতা কাহারও নাই। বান্দার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাই তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন এবং ব্যবস্থা দেন।

পথহারা বান্দার জন্য আল্লাহ্তায়ালার প্রেমের দৃষ্টান্ত
এক সদ্য সন্তানহারা জননীর ন্যায়

আপন বান্দাকে দর্শন ও সান্নিধ্য দানের জন্য তিনি স্নেহময়ী মাতা অপেক্ষাও প্রেমময় ও আগ্রহশীল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এ সম্বন্ধে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একদা এক যুদ্ধের

অবসানে একটি স্ত্রীলোক তাহার হারানো সন্তানকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া যুদ্ধের পরিত্যক্ত ময়দানে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ সমূহের মধ্যে যে কোন যুবকের লাশকে দেখিলেই সে নিজ সন্তান মনে করিয়া উহাকে তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার সন্তান নহে বুঝিয়া তাহাকে নামাইয়া দিয়া, একের পর এক যুবকের লাশকে স্নেহশীল কোল দিতে দিতে আগাইয়া যাইতেছিল। হযরত রসুল করীম (সা:) এই করুণ দৃশ্যের প্রতি সাহাবা (রা: আ:)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কি ঐ মহিলাটিকে দেখিতেছ যে, তাহার হারানো সন্তানকে পাইবার জন্য সে কি গভীর বেদনাভরা আকুল স্নেহে সারা ময়দানে ছুটাছুটি করিতেছে? আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার পথ-ভ্রান্ত দাসকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ঐ স্ত্রী-লোকটি অপেক্ষাও অধিক বেদনাভরা প্রেম রাখেন। মানব জাতির প্রতি সুরা ফাতেহার অথাচিত তোহ্ফা কি এই প্রেমের উৎকৃষ্ট নিদর্শন নহে? কত গভীর প্রেমে তিনি এই সুরার মাধ্যমে পাপীতাপী, পথভ্রান্ত, পথহারা এবং তাঁহার সান্নিধ্যলাভে আগ্রহী ও সান্নিধ্য-প্রাপ্ত সকল বান্দার সম্মুখে তাঁহার অপার করুণা লাভের জন্য সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সুরা মানবজাতির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। ইহার আয়াত ও শব্দগুলিকে যতই নিঙড়ানো যায়, উহাদের মধ্য হইতে ততই অমৃত ক্ষরণ হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলিয়াছেন যে এই সুরায় এত তথ্য ও তত্ত্বাবলী নিহিত আছে যে, উহার এক দশমাংশ বর্ণনা করিতেও এক বড় গ্রন্থের প্রয়োজন।

অশেষ সৌন্দর্য ও কল্যাণে পরিপূর্ণ এই সুরা একাধারে দোওয়া ও দোওয়ার প্রেরণা-উদ্দীপক, পথ ও পথ-প্রদর্শক এবং কবুলীয়ত ও সাফল্যের নিশ্চয়তা বিধায়ক। ইহার মধ্যে দোওয়ার এমন উত্তম পন্থা বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পন্থা আর নাই।

দোওয়ার কবুলীয়তের জন্য দুইটি বিষয় জরুরী

দোওয়ার কবুলীয়তের জন্য মনের মধ্যে আকুল আগ্রহ ও আবেগের সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ দোওয়া শুধু সাপের মন্ত্র পাঠে পর্যবসীত হয় এবং উহা কোন ফল উৎপাদন করে না। মনে আবেগ সৃষ্টি করিতে দুইটি বিষয় জরুরী:

১। যাঁহার নিকট দোওয়া করা হইবে, তিনি পূর্ণ, সর্বশক্তিমান এবং সর্বগুণ ও করুণার অধিপতি হওয়া প্রয়োজন এবং প্রার্থনাকারীর সকল চাওয়া পুর্ণ করার ক্ষমতা ও মমতা তাঁহার থাকা চাই।

২। উক্ত সত্বাকে সম্মুখে জানিয়া প্রার্থনাকারী নিজেকে একান্ত অসহায় ও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। কেন না সেই মহিমান্বিত সত্বার সম্মুখে প্রকৃতপক্ষে বান্দা অতীব নগণ্য।

এই দুই শর্ত পূর্ণ না হইলে সত্যিকার দোওয়া এবং কবুলীয়ত আশা করা যায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ্তায়ালার সর্ব-ব্যাপী রবুবীয়ত, রহমানীয়ত, রহীমীয়ত ও মালেকীয়তের গুণ চতুষ্টয় বান্দার মনে প্রয়োজনীয় প্রেরণার সৃষ্টি করে এবং বান্দার নিজের সম্পূর্ণ অসহায়তার উপলব্ধি বোধ তাহাকে সঠিক ভাবে প্রর্থনা-রত করে এবং কবুলীয়তকে নিশ্চিত করে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থনাকারীর মনে আল্লাহ্তায়ালার শক্তি এবং বান্দার প্রতি করুণা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে এবং নিজের শক্তি, সামর্থ ও উপায় সম্বন্ধে চেতনা ও ভরসা থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দোওয়ায় কোন ফল লাভ সম্ভব হইবে না। যে নিজেকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিলীন করিয়া এবং তাঁহার উপর পূর্ণ আস্থা রাখিয়া দোওয়া করে, তাহার দোওয়া অবশ্যই কবুল হয়। "আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য যাচনা করি" আয়াতে দোওয়ার এই সঠিক মনোভাব প্রাতিফলিত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী দোওয়ার উপরোক্ত দুইটি শর্ত যত বেশী পালন করিবে, তাহার সাফল্য তত বেশী নিশ্চিত। এই সুরা দ্বারা ফল লাভ করার এই অপরিহার্য বিষয় দুইটি বলিয়া এখন ব্যাখ্যা শেষ করিতেছি।

আমাদের আলোচনা হইতে পাঠক উপলব্ধি করিয়াছেন, সুরা ফাতেহা এমন এক ব্যাপক ও কামেল দোওয়া, যাহা আল্লাহ্তায়ালা আপন অযাচিত করুণায় বান্দাকে তাঁহার নিকট নিবেদন করিবার জন্য শিখাইয়াছেন। অপর কোন ধর্ম ইহার মোকাবেলায় কোন দোওয়া ও কবুলীয়তের ব্যবস্থা পেশ করিতে পারে না। পাঠক! পর্যালোচনা করিয়া দেখুন কিভাবে এই সুরার মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মানব-স্বভাব ও মনস্তত্বের নকশা আঁকা হইয়াছে এবং কিভাবে এই ক্ষুদ্র সুরায় বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে। জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের উপলব্ধি করা কর্তব্য যে, ইসলাম ব্যতিরেকে অন্য কোন মুক্তি-প্রদানকারী ধর্ম নাই এবং কুরআন ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক-ব্যাধি নিরাময়কারী এবং মানবকে ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিবার জন্য আর কোন গ্রন্থ নাই।

"آمين"

সহি হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়িয়া সুরা ফাতেহা শেষ করিতেন, তখন তিনি "আমীন" বলিতেন। ইহার অর্থ "হে আল্লাহ্! আমার নিবেদন তুমি মনজুর কর।" সাহাবা কেরাম (রাঃ আঃ)-ও সুরা ফাতেহার শেষে "আমীন" পাঠ করিতেন। আমরাও "আমীন" বলিয়া এই তফসীর শেষ করিতেছি।

সকল প্রশংসা একমাত্র জগত সমূহের রব আল্লাহ্তায়ালার জন্য।

———**———

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	৪	গ্রন্থহীণ	গ্রন্থহীন
১৬	২৪	ব্যপিয়া	ব্যাপিয়া
২৫	২৫	বিসমিল্লাহ্য	বিসমিল্লাহ
২৬	১৯	ব্যরহার	ব্যবহার
,,	২১	প্রযোগ	প্রয়োগ
২৮	৫	আর-রমান	আর-রহমান
২৯	১	জগদ্বসীর	জগদ্বাসীর
৩০	১৫	প্রশংশা	প্রশংসা
,,	,,	বরংস	বরং
৩২	১৪	ব্যাক্তি	ব্যক্তি
,,	২১	রবুবীয়তেরর	রবুবীয়তের
৩৩	১০	অবস্থার	অবস্থার
,,	২৮	সংযোষিত	সংযোজিত
৩৫	১	উপদান	উপাদান
,,	৩	,,	,,
৩৬	২৮	কেরিয়াছে	করিয়াছে
৩৮	১৮	উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্য
৩৯	২৮	প্রাকাশিত	প্রকাশিত
৪০	২৬	ক্রটির	ত্রুটির
৪২	২৯	রহেস্যর	রহস্যের
৪৯	১৫	তোমারা	তোমরা
,,	২৪	সমিষ্টিগতভাবেই	সমষ্টিগতভাবেই
৫৬	১৪	উৎকৃষ্টর	উৎকৃষ্টতর
,,	২৮	জড়-বিশ্বরে	জড়-বিশ্বের
৫৯	৬	হেদায়েতে	হেদায়েত
৬৭	২২	মর্যদা-প্রাপ্ত	মর্যাদা-প্রাপ্ত
৭২	২৬	হইল হইল	হইল
১১০	১১	ক্রটি	ত্রুটি